রামানুজন জন্ম শত বার্ষিকী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কালের পথিক:

শ্রীনিবাস রামানুজন

সাধন দাশগুপ্ত

কালের পথিক
শ্রীনিবাস রামানুজন

সাধন দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006

প্রকাশক ঃ
ডঃ সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা-700 006

প্রথম প্রকাশ ঃ 22শে ডিসেম্বর, 1988

মুদ্রক ও প্রচ্ছদ ঃ
শৈলী—
শ্রীনবকুমার দত্ত
4এ, মানিকতলা মেইন রোড
কলিকাতা-700 054

মূল্য ঃ 16·00 টাকা

উৎসর্গ

আবিষ্কর্তা গডফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি
এবং
উপেক্ষিতা জানকী রামানুজন

মুখবন্ধ

শতবর্ষের আলোকে কালের পথিক এস. রামানুজনের অসাধারণ গণিত প্রতিভাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরার জন্য একটি পুস্তক রচনার কথা বেশ কিছুদিন থেকেই পরিষদ চিন্তা করছিল। অনন্য সাধারণ এই গণিত বিজ্ঞানীকে চিত্রিত করার জন্য সুপরিচিত বিজ্ঞান লেখক শ্রীসাধন দাশগুপ্তকে অনুরোধ করা হয় এবং তিনি এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই গণিতবিদের অমর প্রতিভার কথা পুস্তকাকারে রচনা করে দেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছেন এজন্য পরিষদ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভারতের এক অখ্যাত গ্রামে জন্মে এবং দারিদ্রের চাপে নিষ্পেষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী না পেয়েও এবং ক্ষণকালীন জীবনে যে গণিত-পথিক বিশ্বের শুদ্ধ গণিতের দরবারে আপন নামকে চির ভাস্বর করে রেখে গেছেন সেই রামানুজনকে জানতে ভারতের সব ভাষায় তাঁকে নিয়ে বই লেখার সময় অনেকদিন আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই শতবর্ষ পরে হলেও সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে শ্লথগতিতে চলেও বিজ্ঞান পরিষদ এই অসামান্য গণিতবিদের উপর পুস্তক প্রকাশ করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে।

বাংলার প্রতিটি ঘরে ছাত্র-ছাত্রীদেও কাছে যখন এই বইটি পেঁৗছাবে তখনই পরিষদের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হবে।

পুস্তকটি মুদ্রন ও প্রকাশনে সযত্ন সহযোগিতা করায় স্নেহভাজন শ্রীনবকুমার দত্তকে পরিষদ স্মরণে রাখবে।

ডঃ সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কলিকাতা
২২শে, ডিসেম্বর, ১৯৮৮

ভূমিকা

এই শতকের ছয়ের দশকে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বিবিসি একটি সিরিয়াল প্রচার করেন ; মানবিক গুণ হলো বিষয়বস্তু। আলোচনার সূত্রপাত করতেন প্রসিদ্ধ লেখক সাংবাদিক অথবা বিজ্ঞানীরা। এই সিরিয়ালের Magnanimity বিষয়ের মুখবন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক ইভিলিন ওয় (Waugh) বললেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও মানুষের সমাজে দয়া-কৃপা-করুণা-দাক্ষিণ্যের প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও এরা বিরল নয়। বিরল হলো Magnanimity ; হৃদয়ের প্রসারতা বা Broadness—তারও প্রকাশ অবরেসবরে ধরা যায়। দেখা যায় না হৃদয়ের বিশালতার চিহ্ন—Magnanimity ! প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এই বিশাল হৃদয়ের চিহ্ন দেখা যায় পিয়ের-মেরি কুরির বদান্যতায়—যাঁরা রেডিয়ামকে মানব সমাজের জন্য দান করে গেলেন। আর প্রথম মহাযুদ্ধের পর হৃদয়ের বিশালতার এজাতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় রামানুজন-হার্ডির ভাবনায়। অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী রামানুজন তাঁর যাবতীয় গাণিতিক কাজ নিঃশর্তে নিঃস্বত্বে হার্ডির হাতে দিয়ে গেলেন ; তিনি জানেন, হার্ডি সেই কাজের ধারা গণিতের জগতে বজায় রাখবেন। হার্ডি মারফৎ রামানুজন তাঁর কাজ জগৎকে দিয়ে গেলেন। হার্ডি সেই দান গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন, রামানুজনের সব কাজ তিনি বোঝেন না। তাই কেম্ব্রিজের অন্য গণিতজ্ঞদের হাতে রামানুজনের নোটবই তুলেদিতে তাঁর দ্বিধা নেই। কারণ রামানুজনের কাজ মানুষের সংস্কৃতির অঙ্গ, কারোর একা নয়। শ্রী ওয় (Waugh) মনে করেন, মহানুভবতার উদাহরণ হলো রামানুজনের এই দান আর হার্ডির এই গ্রহণ ! এটিই Magnanimity !ooooo

এই বছরের মে মাসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত শ্রীনিবাস রামানুজনের জীবন ও কালের কথা লিখতে বলেন। তাঁরই আগ্রহে এই লেখার সূচনা ! ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্র-হিসেবে একজন শুদ্ধ গণিতের বিশেষজ্ঞকে চিনতে চাওয়া বাতুলতা মাত্র। তবু বহু শুভানুধ্যায়ীর অকৃত্রিম উৎসাহে এই লেখাটির শুরু ও শেষ ঘটে।

কলকাতার তিনটি দূতাবাসের কাছে ঋণস্বীকার করি। হাঙ্গেরির দূতাবাসের সাহায্য ইরডোসের গবেষণা ও রচনা দেখার সুযোগ পাই। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় নানা পত্র পত্রিকা পুস্তিকা পড়ার সৌভাগ্য ঘটে। একইভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমেরিকান সেণ্টার ; বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের শ্রী সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ এস এ'র পেনসেলভিনিয়া ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে হার্ডি-লিটলউড-ওয়াটসন-নেভিল এবং বার্নট-এন্ড্রুজ-আস্কের গবেষণা ও রচনা পাঠের সুযোগ জোটে। এস আর রঙ্গনাথন ও সুরেশ রামের লেখা জীবনীদুটি ডঃ সুকুমার গুপ্তর সাহায্যে হাতে পাই। হাভার্ডের ত্রিশত বার্ষিকী উৎসবে 1937 সালে প্রদত্ত হার্ডির বক্তৃতাটি কলকাতার Science & Culture পত্রিকায় (Vol II No 12, June 1937 P-604-607)প্রকাশিত হয়েছিল। এর কপিটি INSA'র কৃপায় হস্তগত হয়। বার্নটের পাণ্ডুলিপি ব্যাখ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং টাটা ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত রামানুজনের নোটবই দুটি আমার এক বন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে আমাকে পড়তে দেন। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা জানা নেই।

ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামানুজন সম্পর্কিত গবেষণা পত্র ও সেন্টিনারি সেমিনার পত্রিকাগুলি ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাসের সহায়তায় পড়ার সুযোগ পাই। এছাড়া ডঃ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ বিশ্বাস পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে অমূল্য উপদেশ দিয়ে আমাকে ঋণী করে রেখেছেন। একই ঋণে ঋণী ডঃ সুশ্বেতা বিশ্বাসের কাছে।

তবু গত কয়েক বছরে রামানুজন সম্পর্কে যে গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে—যার সংখ্যা দু'শর বেশি—তার একটি সামান্য অংশ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যেটুকু হাতে পেয়েছি, তা বিস্মিত ও অভিভূত করার পক্ষে যথেষ্ট।

সম্পূর্ণ লেখা লিখতে সাহায্য করেছে দুজন কল্যানীয়া কিশোরী, রিনকু ও টুকরি। এদের দুজনের সমালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতেই লেখাটির শুরু ও শেষ।

এই লেখাটিতে রামানুজনের গণিত নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা নেই। তাঁর গণিত হলো বিশেষজ্ঞদের জন্য। এবং এই জীবনীটি

ডঃ গুপ্তের ইচ্ছানুসারে সাধারণ বাংলাভাষী পাঠকের জন্য বলে, এখানে গণিতের উল্লেখ আছে মাত্র। গণিত জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসু গবেষক-ছাত্ররা যদি বার্নটের ব্যাখ্যা পড়েন তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন। আশাকরি রামানুজনের গণিতের উপর লেখা বইকটি ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজের লাইব্রেরিতে অদূর-ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। কারণ যে দুজন ভারতীয় মানুষকে আমরা বিশ্বসংস্কৃতির পটভূমিতে সর্বকালীন প্রথম সারিতে দেখতে পাই, তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয়জন---রামানুজন। এই দ্বিতীয় জনের জীবনী নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

একজন কালের পথিকের পদচিহ্নের হদিশ বহু মানুষের প্রয়াসে পাওয়া যায়। সেই বিস্মিত কৌতূহলী মানুষগুলির খুঁজে পাওয়া হদিশের উপকরণ নিয়ে সেই পথিকের পথের বর্ণনা। তাঁদের দেখার বিস্ময় আনন্দ নিয়ে বাংলাভাষী পাঠক সমাজ রামানুজনের স্পর্শ যদি পান, তবেই এলেখার সার্থকতা।

কলকাতা

সাধন দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

শ্রীনিবাস রামানুজন —(কেম্ব্রিজে রাখা ছবি)
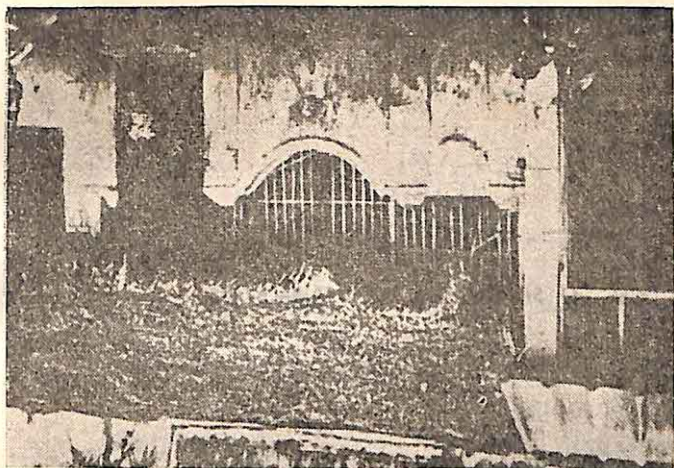
রামানুজনের শৈশব গৃহ —(অধ্যাপক বার্নটের তোলা ছবি)

খেলার মাঠে হার্ডি —(বিবিসির সৌজন্যে)

[223]

Madras

5th Aug. 1913.

From S. Ramanujan, Scholarshipholder in Mathematics.

To The Board of Studies in Mathematics

Through The Registrar, University of Madras.

Gentlemen,

With reference to para 2 of The University Registrar's letter no. 1631 dated the 9th April, 1913, I beg to submit herewith my quarterly Progress Report for the quarter ended the 31st July, 1913.

The Progress Report is merely the exposition of a new theorem I have discovered in Integral Calculus. At present there are many definite integrals the values of which we know to be finite but still not possible of evaluation by the present known methods. This theorem will be an instrument by which at least some of the definite integrals whose values are at present not known can be evaluated. For instance, the integral treated in Ex. (v) note Art 5 in the paper, Mr. G. H. Hardy M.A., F.R.S., of Trinity College, Cambridge considers to be "new and interesting". Similarly the integral connected with the Besselian

[22A]

function of the n^{th} order which at present requires many complicated manipulations to evaluate can be readily inferred from the theorem given in the paper. I have also utilised this theorem in definite integrals for the expansion of functions which can now be ordinarily done by Lagrange's, Bürmann's, or Abel's theorems. For instance, the expansions marked as examples nos. (3) and (4) Art. 6, in the second part of the paper.

The investigations I have made on the basis of this theorem are not all contained in the attached paper. There is ample scope for new and interesting results out of this theorem. This paper may be considered the first instalment of the results I have got out of the theorem. Other new results based on the theorem I shall communicate in my later reports.

I beg to submit this, my maiden attempt, and I humbly request that the Members of the Board will make allowance for any defect which they may notice to my want of usual training which is now undergone by College Students and view sympathetically my humble effort in the attached paper.

I beg to remain,
Gentlemen,
Your obedient servant,
S. Ramanujan.

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা প্রথম চতুর্মাসিক রিপোর্টের অংশ।
(মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে)

Matlock House
Matlock

Dear Mr Hardy,

My words are not adequate to express my thanks to you. I did not even dream of the possibility of my election. When I opened your telegram I read thus: a Fellow Philosophical Society instead of Royal Society. I came to know only very recently of my election to Cambridge Philosophical Society — and I was very much puzzled why you sent a telegram from Piccadilly for that. It is only after some time that I read your telegram correctly.

Please convey my heartfelt thanks to Major MacMahon and Mr Littlewood. I am sorry I didn't write to them as I did not know their addresses.

Ever yours

S. Ramanujan

এফ আর এস হবার সংবাদ শুনে হার্ডিকে লেখা রামানুজনের চিঠি। —(কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যায় ঃ এক

গৌরচন্দ্রিকা

1913 সালের জানুয়ারি মাস। বাইরে, ইংলণ্ডে, হাড় কাঁপানো শীত। খবর কাগজে তুরস্ক আর বলকান স্টেটগুলোর যুদ্ধের খবর বড় বড় করে ছাপা। কারণ যুদ্ধ যেন ইউরোপে ক্রমশ আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে সদর্পে এগিয়ে আসছে। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির গণিতের অধ্যাপক গডফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি (G. H. Hardy) যুদ্ধ পছন্দ করেন না; তাঁর ভালবাসার একটিই বিষয়—সেটি গণিত, ম্যাথামেটিকস। সেখানে আবার তাঁর পছন্দ হলো শুদ্ধ গণিত। ফলিত গণিতে কোথাও যেন কেজো চেহারার, আড়ালে যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ লুকিয়ে থাকে। তাঁর নিজের লেখা বই, 'একটি গণিতবিদের কৈফিয়ৎ' (A mathematician's Apology)-এ লিখলেন, 'খাঁটি অঙ্ক যুদ্ধ এড়িয়ে চলে;—হার্ডি অঙ্ক চেনেন; যা চেনেন তাকে আরো ভালোভাবে জানতে বুঝতে চান। অঙ্কই তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

সেদিন, জানুয়ারি মাসে, বাইরে ঝিরঝির করে তুষার ঝরছে। ওরই মধ্য দিয়ে গাউন পরে এদিকে ওদিকে ছাত্র অধ্যাপকরা যাতায়াত করছে। হার্ডির জানলার শার্সির ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য অস্পষ্ট। ভেতরে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানো। তার কাছে, চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে বসে, পাশে রাখা টেবিল থেকে কাগজপত্র টেনে নিয়ে হার্ডি পড়তে বসলেন। সকালের খবর কাগজে চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রেখে টেনে নিলেন সেদিনের ডাকে আসা চিঠিগুলি। অনেক চিঠি হার্ডি পান। সব চিঠি খোলার আগে, হার্ডির অভ্যেস হলো খাম আর ডাকটিকিটগুলো দেখা। সেদিন খামগুলো দেখতে দেখতে একটি ব্রাউন রঙের খানিকটা দোমড়ানো ম্যানিলা এনভেলাপের টিকিটের দিকে তাকালেন হার্ডি। অচেনা ডাকটিকিট। উপরে পোস্ট অফিসের ছাপ পড়া যায়—মাদ্রাজ, 16ই জানুয়ারি 1913 সাল। কৌতূহলী হার্ডি খামটা খুলে পেলেন একতাড়া কাগজ আর অচেনা হাতে লেখা এক চিলতে চিঠি। কী লেখা? হার্ডি পড়তে শুরু করলেন,—

'মহাশয়,

প্রারম্ভেই নিজের পরিচয় জানিয়ে লিখছি যে আমি পোর্ট ট্রাস্ট অফিসের একাউণ্ট বিভাগের একজন ক্লার্ক, মাইনে পাই বছরে সাকুল্যে 20 পাউণ্ড। বয়স প্রায় তেইশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি আমার নেই, তবে স্কুলের সাধারণ শিক্ষাক্রম পাশ করেছি। স্কুল পেরিয়ে অবসর সময়টুকু অঙ্ক নিয়েই কাটিয়ে চলেছি। ইউনিভার্সিটির ছকবাঁধা সাধারণ পাঠক্রমের পথে না গিয়ে নিজেই এক নতুন পথে চলেছি। ডাইভারজেণ্ট সিরিজ নিয়ে সাধারণভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে যে সব ফল আমি পেয়েছি তা দেখে এখানকার গণিত সমাজ বলেছেন বিস্ময়কর (Startling)।'....

....এ পর্যন্ত পড়ে হার্ডি মনে মনে বললেন, 'ঈশ্বর, আরেক পাগলের পাল্লায় আমাকে ফেললে! আরেকটু পরে লোকটা লিখবে ও জানে গোলকে কি করে চৌকো করতে হয়।'....চিঠি ছেড়ে সংগে পাঠানো কাগজগুলোর দিকে চোখ রাখলেন হার্ডি। অনেক ফর্মুলা। কতগুলো চেনাজানা। আর কতগুলো সত্যি অদ্ভুত। 'বিস্ময়কর' কী ?....চিঠিটা আবার পড়তে শুরু করলেন হার্ডি।....

'সাধারণ গণিতে আপনারা যেমন a^n এর একটা মান জানাবার সময় n এর পজিটিভ মান ধরে তার নেগেটিভ আর ভগ্নাংশ মানের তালাস করেন, আমিও তেমনি অয়লারের সেকেণ্ড ইন্টিগ্রেল মোতাবেক n এর সব মানের তালাস করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছেন,

$$x^{n-1}e^{-x}\,dx = \Gamma(n)$$

তখনই সত্য যখন n হবে পজিটিভ। তারা আরো বলেছে n কে নেগেটিভ ধরলে ঐ ইন্টিগ্রেলের সম্পর্ক খাটবে না। ধরে নেওয়া যাক ঐ সম্পর্কটি শুধু n এর পজিটিভত্বের উপর নির্ভরশীল, আরো ধরা যাক $n\,\Gamma(n) = f\,\Gamma(n+1)$ হলো সর্বজনীন সত্য, তাহলে কিন্তু ঐ ইন্টিগ্রেল সমীকরণটি n এর নেগেটিভ বা ভগ্নাংশ মান ধরেও প্রমাণিত হবে। আমার গবেষণার ভিত্তিতে আছে ঐ চিন্তা বা ধারণা। আর তারই সাপেক্ষে আমি যা পেয়েছি বা করেছি তা স্থানীয় গণিতবিদদের বোঝার বাইরে। উচ্চগণিতে আমার এই যাত্রা তাদের অবোধ্য আর অগম্য।'

....চিঠির এই অংশ পড়ে হার্ডি মুচকি হাসেন। লোকটা পাগল হলেও মজার। স্পষ্টাস্পষ্টি বেশ লেখে।—সংগের ফর্মুলাগুলো আরো হয়তো মজার হবে। চিঠিটা শেষ করা যাক।...

'আপনার প্রবন্ধ অর্ডারস অফ ইনফিনিটি (Orders of Infinity) সেদিন পড়লাম। সেখানে 36 পৃষ্ঠায় আপনি জানিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ছোট কতগুলো অবিভাজ্য মৌলিক (Prime) সংখ্যা যা থাকতে পারে তার কোনো নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি (Expression) নেই। আমি একটি গাণিতিক অভিব্যক্তি পেয়েছি যেখানে উত্তর যা পাওয়া যায় তা প্রায় সঠিক ; ভুলের মাত্রা নগণ্য। এই চিঠির সংগে পাঠানো কাগজকটা আপনাকে পড়তে অনুরোধ করছি। আমি দরিদ্র। তাই যদি মনে করেন, আমার কাজের দাম আছে তবে দয়া করে এগুলি প্রকাশের চেষ্টা যদি করেন ! আমার লেখায় আমার গবেষণার বর্ণনা দিইনি, জানাইনি অভিব্যক্তির প্রাঞ্জল রূপ। শুধু দেখিয়েছি কোন পথে আমি চলেছি, তার ইংগিত। অনভিজ্ঞ আমি। আপনার উপদেশ আমার কাছে অনেক মূল্যবান জানবেন। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মার্জনা চাইছি। ইতি বিনয়াবনত

এস্ রামানুজন।'

....চিঠি শেষ করে হার্ডি চুপ করে বসে থাকেন। হাতে তখনো চিঠিটা, সামনে চিঠির সংগে পাঠানো কাগজের তাড়া !....লোকটাকে সাধারণ পাগল বলে তো ভাবা যাচ্ছে না। সাধারণ পাগলরা আরো হামবড়া, আগ্রাসী হয়। লেখককে দাম্ভিক ভাবা যাচ্ছে না। অথচ লেখার ছত্রে ছত্রে নিজের কাজে আস্থা প্রকাশ পাচ্ছে ! পাগল। কেমন পাগল লোকটা ?....চিঠি ছেড়ে হার্ডি সেদিনের খবর কাগজটা টেনে নেন, খেলার পাতায় অস্ট্রেলিয়াতে ইংলণ্ডের ক্রিকেটের খবর পড়তে থাকেন। যেমনটি রোজ করে থাকেন। তারপর কাগজ ছেড়ে গাউন গায়ে চাপিয়ে ক্লাসে পড়াতে চলে যান। তিনি পড়াবেন এনালেটিক ম্যাথামেটিক্স। সামনে হেঁটে যান হার্ডি। পেছনে থাকে বদ্ধ দরজা, যার পেছনে রাখা একটি পাগলের চিঠি। হাঁটতে হাঁটতে হার্ডি হাসেন। লোকটা পাগল না হলেও অদ্ভুত কিন্তু। সংগের কাগজকটাতে কিন্তু অচেনা অজানা সমীকরণ চোখে পড়েছে। যাকগে।....হার্ডি তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের উনিশবিশ পছন্দ করেন না। সে কথা তাঁর লেখা 'একটি গণিতবিদের কৈফিয়ৎ' বইটির ভূমিকায়

সি পি স্নো (C. P. Snow) লিখেছেন। সেদিনেও হার্ডি তাঁর কাজের রুটিন মেনে চললেন ;... ক্লাসে পড়ালেন, অধ্যাপকদের সংগে একটু আড্ডা দিলেন, গবেষকদের সংগে আলোচনা করলেন, বিকেলে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির পাশে টেনিস কোর্টে সতীর্থ সহযোগীদের সংগে খেললেন। অবিবাহিত ব্যাচিলর হার্ডির ছক বাঁধা কেজো জীবনে বাইরের তরংগের কোনো আঘাত সহজে নেমে আসে না। তবু সব খুটখাট রুটিন মেনে চলে ফিরে সন্ধ্যেবেলা যখন ঘরে ফিরে আসছেন, তখন আবার সেই চিঠির কথা মনে পড়ে। সংগে পাঠানো কাগজে চেনা জানা ফর্মুলার পাশে রয়েছে অদ্ভুত কতগুলো ফর্মুলা। ওগুলো কী সত্যি ? হার্ডির মনে অস্বস্তির খোঁচা খচখচ করে ওঠে।....
....সেদিন সন্ধ্যেতে অধ্যাপকদের খোলামেলা আড্ডায় চিঠির গল্পটা পাড়লেন হার্ডি ! উলটো চেয়ারে বসা তাঁর সহকর্মী আর গবেষণায় সহযোগী জন লিটলউডকে বললেন অদ্ভুত সমীকরণ ফর্মুলার কথা। কাঠবাদাম চিবুতে চিবুতে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে লিটলউড হঠাৎ উৎসাহী হয়ে বললেন, চলো, তোমার খচখচানি কাটাতে ঘণ্টা খানেক সময় ঐ ফর্মুলাগুলোর পেছনে দেওয়া যাক।'—পাশের দাবা খেলার ঘরটা তখন ফাঁকা। সেই ঘরে দুই বন্ধু মাদ্রাজ থেকে এস. রামানুজনের পাঠানো চিঠি আর কাগজ নিয়ে বসলেন। লিটলউডকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে অন্য অধ্যাপকদের দিকে তাকিয়ে হার্ডি বললেন, 'এই লোকটা হয় পাগল নয় এক প্রতিভা। একটি জিনিয়াস।'

এক ঘণ্টা নয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর দুইজন চেসরূম দাবা খেলার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হার্ডির চোখমুখ উত্তেজনায় কাঁপছে। লিটলউডের মুখে হতভম্বের ভাব। হার্ডি বললেন,—বললেন না, ঘোষণা করলেন,—'চিঠির লেখক লোকটা পাগল না—এ জিনিয়াস।'....

—1913 সালের জানুয়ারি মাসে ঠিক কী ঘটেছিল তার কোনো লিখিত দলিল নেই। আছে হার্ডির স্মৃতিকথায়, লিটলউডের নিবন্ধে, আয়ান স্টেয়ার্টের (Ian Stewart) বিজ্ঞান সাহিত্যে। সেখানে একটি কথা প্রকাশ পেয়েছে, চিঠির লেখক পাগল নয়, ক্র্যাঙ্ক (Crank) নন। একটি প্রতিভা। হার্ডি একটি প্রতিভার খোঁজ পেলেন। কেম্ব্রিজের গণিত সমাজে আলোড়ন জাগে। সেই

আলোড়নের গল্প অধ্যাপক নেভিল (Neville) 1941 সালের 22শে এপ্রিলের রেডিও বক্তৃতায় জানালেন—

...."কেম্ব্রিজের গণিত সমাজে সেদিন ঐ চিঠি কী যে আলোড়ন তুলেছিল তা কোনোদিন ভোলা যাবে না। একজন অচেনা অজানা ভারতীয় কেরানি অনভিজ্ঞ বলে উপদেশ চাইছেন, গরিব বলে তাঁর পাঠানো থিওরেমের প্রকাশের জন্য সাহায্য চাইছেন। বলেছেন, 'অবশ্য আপনি যদি মনে করেন আমার কাজের দাম আছে তবেই।' ঐ কেরানী, নাম না জানা অচেনা অজানা মানুষটা, যে সব থিওরেম কোনো বর্ণনা প্রমাণ ছাড়া পাঠালেন, তা যেন সারা বিশ্বের অতি উন্নত গণিতের পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র। প্রথমেই যা মনে হয়, তা হলো ঐসব থিওরেম উপপাদ্য বিষয়গুলি সব ভাঁওতা, চেনাজানা বিষয়কে অন্যভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। কিন্তু একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় ঐ ধারণা ধোপে টিকছে না। কারণ ঐ চিঠিরর সংগে পাঠানো এমন অনেক ফর্মুলা আছে যাদের চেনাজানা বিষয়ের আওতায় আনা অসম্ভব। হার্ডি এদের দেখে বললেন, 'ওগুলো আমাকে একেবারে কাৎ করে দিয়েছে। এরকমটি আর কখনো আগে দেখিনি। এক পলক দেখেই বলা যায় একমাত্র অতি উচুধরণের গণিতজ্ঞের ধারণায় এদের বিভাস সম্ভব। ওগুলো নিশ্চয় খাঁটি। কারণ খাঁটি না হলেও, এদের এ জাতীয় উদ্‌ভাসন কোনো কল্পনার জগতেও অভাবনীয়।'........—একজন মহাগাণিতিক বন্ধুবান্ধবদের ঘাবড়ে দিতেও এজাতীয় সম্পূর্ণ নতুন, আর অশ্চর্যের ফর্মুলার কথা চিন্তাতেও আনতে পারেন না।"—

হার্ডির সামনে একটি খনিজ হিরে—যার দ্যুতি কিছুটা অস্পষ্ট। খনির ক্লেদ তার গায়ে মাখা। তবু এটি যে হিরে তা চিনতে অসুবিধে হয় না। সেদিন রাত্রে হার্ডি রামানুজনের চিঠির জবাব দিলেন। আর চিঠি লিখলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এস, রামানুজন নামে পোর্টট্রাস্টের একাউন্টবিভাগের ক্লার্কটির খবর জানতে চান তিনি।

অধ্যায় ঃ দুই

গোষ্ঠলীলা (1887-1903)

উনিশ শতকের শেষ আর বিশশতকের আরম্ভের বৃটিশ ভারত। মানচিত্র দেখে পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রনজিৎ সিং যেমন বলেছিলেন, সব লাল হো জায়গা—তেমনি ভারতবর্ষের রঙ মানচিত্রে লাল, শুধু মাঝেমাঝে দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলো জানাতে হলুদের ছোপ— সেখানে আছে হায়দ্রাবাদ, মহিশুর, কাশ্মীর আর মধ্যপ্রদেশের হোলকারের সিন্ধিয়ার রাজ্য ; গুজরাট, রাজপুতানা আর উড়িষ্যার রাজাদের সাম্রাজ্য ; পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ কেরল বা বাংলার দেশীয় রাজাদের রাজ্য। তাছাড়া বৃটিশ ভারতে শাসনের সুবিধের জন্য আছে এগারোটি প্রদেশে ; বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। সেদিনের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি আকারে আয়তনে বিরাট বিশাল। উড়িষ্যার নিচ থেকে আরম্ভকরে বিস্তৃতি কন্যাকুমারী পর্যন্ত। গোটা দক্ষিণভারত যেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আওতায়। দক্ষিণী মানুষকে মাদ্রাজী বলতে বাধে না। 1912 সালে দিল্লী দরবারে দিল্লীকে ভারতবর্ষের রাজধানী ঘোষণা করার আগে সেদিনও বৃটিশ ভারতের রাজধানী হলো কলকাতা। সেখানে থাকেন গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট। আর প্রদেশগুলোতে আছেন লেফটানেণ্ট গভর্ণর বা ছোটলাট।

বৃটিশভারত লাল হয়ে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হেফাজৎ থেকে বেরিয়ে যাবার পর ইংরেজরা এদেশে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শিক্ষা নিয়ে ভাবেন। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো। 24শে জানুয়ারী 1857 সালে প্রথমে কলকাতা, তারপর একই সালে জুলাইয়ে বোম্বাই এবং সবশেষে সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। স্কুল কলেজে পড়াশোনা শিক্ষার মাধ্যম হলো, মাতৃভাষা নয়, ইংরিজি। মেকলে এবং বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি আর ভাষাকেই উচ্চ শিক্ষাক্রমে বেছে নিলেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কুম্ভকোনম শহরে একটি সরকারি কলেজ ছিল। কলেজটিকে বলা হতো প্রাচ্যের কেম্ব্রিজ। কারণ এই কলেজটিতে ছিলেন বাঘাবাঘা গণিতজ্ঞরা। গণিতের শিক্ষাক্রমে এই কলেজের তুলনা সেদিন ভারতে ছিল না।

পাশ্চাত্যে গণিত বা বিজ্ঞানের কেন্দ্রে ছিল এবং আছে কয়েকটি নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়। ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ, জার্মানিতে মিউনিক-বার্লিন-গোটেনগেন, ফ্রান্সে সোবর্ণ, যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড,—এম আই টি অথবা প্রিন্সটন। একেকটি বিজ্ঞানী গণিতবিদের নাম আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে থাকে। যেমন নিউটন-কেম্ব্রিজ, হিলবার্ট-গোটেনগেন, পোঅাঁকার-প্যারিস, নিয়েলবোর-কোপেনহাগেন অথবা নর্বাট হ্বিনার—এম আই টি। প্রাচীন ভারতে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ছিলেন মহাগাণিতিক —যাঁদের ছাত্ররাই একেকটি শ্রেণী তৈরি করে গেছেন। পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত গণিতবিদ আর্যভট্ট তাঁর 'গণিতভাগ' নামের পুস্তকটিতে গণিত চর্চার কথা লিপিবদ্ধ করে গেলেন। জানালেন অনেক পদ্ধতি প্রকরণের কথা—যাদের বর্তমান আধুনিক গাণিতিক পরিভাষায় বলা হয় আলগোরিথ্‌ম্ (Algorithm)। এমন অনেক আলগোরিথ্‌ম্ আর্যভট্ট জানালেন যা আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে অয়লারের (Euler) হাতে পুনরায় প্রমাণিত হয়ে লিনিয়ার ডায়োফেনটাইন সমীকরণ (Linear diophantine Equation) নামের সমস্যার সমাধানে হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। আর্যভট্ট একটি গণিত ভাবনার প্রকাশ করলেন—যেটি অন্যান্য গণিতবিদদের হাতে শাণিত হয়ে দাঁড়ায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর গণিতবিদ বরাহমিহিরকে আর্যভট্ট স্কুলের অন্যতম বলা যায়। আবার ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে আবির্ভাব হলো ব্রহ্মগুপ্তের—যিনি আর্যভট্ট স্কুলের বাইরে যেন। তাঁর লেখা 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' এবং এ সময়েই প্রকাশিত 'সূর্যসিদ্ধান্ত' (যাঁর লেখকের নাম নিশ্চিত করে বলা যায় না—সন্দেহ হয় এটিও ব্রহ্মগুপ্তের লেখা।) আর্যভট্টের চিন্তাভাবনা থেকে দূরে নিয়ে যায় ভারতীয় গণিত বোধকে। নবম দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈনদের গণিত-চিন্তা যা 'গণিত সারসংগ্রহ' গ্রন্থে সংকলিত—তা সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ গণিতের বিষয়। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহযোগী গণিতের বর্ণনা নেই—যেমন ছিল আর্যভট্ট-ব্রহ্মগুপ্তের গণিতে।

জৈনদের গণিত স্কুলের বাইরে দ্বাদশ শতাব্দীতে আরো একজন ভারতীয় গণিতবিদ এলেন—দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য—যিনি আর্যভট্ট ও

ব্রহ্মগুপ্তের ধ্যানধারণার সমন্বয়ী। তাঁর লেখা 'সিদ্ধান্ত শিরোমণির' চারটি ভাগ—লীলাবতী (পাটিগণিত সম্পর্কীয়), বীজগণিত (এলজেব্রা) গোলাধ্যায় (স্ফেরিকেল ত্রিকোণমিতি) এবং গ্রহগণিত (জ্যোতি-র্বিজ্ঞান)। এই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় নেপিয়ারের লগারিথম বা নিউটনের ক্যালকুলাসের প্রাথমিক রূপ ধরা দেয়।

মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু গণিত চর্চা মোটামুটি হিন্দু রাজাদের রাজত্বেই হয়। সেখানে ধরা দেয় কেরল স্কুল। যার অন্যতম প্রবক্তা হলেন নীলকণ্ঠ সোমযাজী। এঁদের হাতে যেসব সিরিজ পাওয়া যায়, সেখানে সুবিখ্যাত গ্রেগরি সিরিজের কাঠামোও দেখা দেয়। তাছাড়া থাকে আধুনিক গণিতে যাকে বলা হয় 'কন্টিনিউড ফ্র্যাকসন'—তার রূপাকৃতিও কেরল স্কুলের ভাবনায় ধরা যায়। প্রাচীন ভারত বা কেরল স্কুলের গণিতের প্রকাশে একটিই শুধু ঘাটতি ;—এখানে সমস্যা আছে, তার সমাধান জানানো আছে, নেই সমাধানের পথে আসার বিস্তৃত বর্ণনা। ভারতীয় গণিত চিন্তার সঙ্গে গ্রিক গণিত প্রকাশভঙ্গীর এইখানে তফাৎ। ইউক্লিডের বই-এ সমস্যার সমাধানে প্রমাণের যে বিশদ রীতি, ভারতীয় গণিত পুস্তকে তার অনুপস্থিতি। প্রমাণ জানতে গুরুকে আশ্রয় করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ভারতীয় বিদ্যা হলো গুরুমুখী। এখানে গ্রিকদের আকাদমির চিহ্ন স্পষ্ট নয়। কাজেই ভারতীয় গণিত সর্বতোগামী হতে পারে না। এ যেন ফর্মুলা সর্বস্ব হয়ে থাকে। কী করে সেই ফর্মুলার সৃষ্টি তার সুষ্ঠু ইঙ্গিত হয়তো আছে, নেই বিশদ বর্ণনা অথবা ব্যাখ্যা। অধ্যাপক কায়ে (G. R. Kaye) এবং অধ্যাপক রাজগোপাল ((C. T. Rajgopal) ও রঙ্গচারী (M. S. Rangachari) তাঁদের গ্রন্থে (যথাক্রমে 'ইণ্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্স' এবং 'অন মিডিয়াভেল কেরল ম্যাথামেটিক্স') এ জাতীয় প্রমাণের অনুপস্থিতি দেখে জানালেন, ভারতীয় গাণিতিক ঐতিহ্যের চিন্তাক্রমকে ঢেকে রাখে স্বজ্ঞা বা ইনট্যুশন। ভারতীয় গণিত হলো ইনট্যুটিভ বা ইনট্যুশন জাত !

এই ইনট্যুশন সঞ্জাত গণিত জ্ঞান আর পাশ্চাত্য যুক্তি প্রমাণ গ্রাহ্যগণিত জ্ঞান—দুটি ধারা কুম্ভকোনমে এসে মেশে। দেখা দেয় ভারতের কেম্ব্রিজ। এখানে, কুম্ভকোনমের এক উচ্চ শাখার বৈষ্ণব আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেন রামানুজন—যার পুরো নাম

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার রামানুজন আয়েঙ্গার অথবা শ্রীনিবাস রামানুজন। জন্ম বাইশে ডিসেম্বর 1887 সালে বর্তমান তামিলনাড়ুর কাবেরী নদীর তীরে এড়োর নামের এক শহরে, দাদামশায়ের বাড়িতে। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে স্বাভাবিক নিয়মে মা এলেন বাপের বাড়ি। কুম্ভকোনমের কাছে নামক্কলের দেবী নামগিরির কাছে মানৎ মানা সন্তান হলো রামানুজন। কাজেই ছেলের জন্মের খবর পেয়ে বাবা শ্রীনিবাস দেবী নামগিরির কাছে পূজো দিয়ে এলেন। বহুদিন শ্রীনিবাস-কমলা দম্পতির সন্তান হয় নি। রামানুজন হলেন এই দম্পতীর কাছে দেবীর আশীর্বাদ ধন্য। বাবা শ্রীনিবাস পরিচিত ছিলেন কুপ্পুস্বামী বলে। তিনি পেশায় এক কাপড়ের দোকানের হিসেবরক্ষক বা গোমস্তা। আর দাদামশায় হলেন এড়োর শহরের মুন্সেফের আদালতের এক আমিন। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবার। তবে দুই পরিবারই গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বাড়িতে সংস্কৃত ও শাস্ত্রচর্চা যেমন চালু, তেমনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দেবদ্বিজে ভক্তি, প্রথাপ্রকরণে কোনো ঘাটতি নেই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গোঁড়া তামিল পরিবারে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তবে ঐতিহ্যের বন্ধনের মুক্তি ঘটে না।

বাজারের কাপড়ের দোকানের কেরানি শ্রীনিবাসের আয় বাড়েনা। সংসার ওদিকে বেড়ে চলে। নিজের বৃদ্ধ বাবা আর মা ছাড়া আছেন স্ত্রী কমলাট্টাম্মাল; তাছাড়া বড় ছেলে রামানুজনের পর জন্মায় আরো দুটি ছেলে। সাতজনের মুখে খাবার জোগাতে হয়। অথচ বাড়িতে ঘর বলতে একটি। আধপাকা আধকাঁচা বাড়ি। উপরে খড়ের ছাউনি। মফস্বল শহর কুম্ভকোনম বলে সেখানে খরচ খরচা কম এইটুকুই যা ভরসা। মাদ্রাজ শহর থেকে কুম্ভকোনম দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় 250 কিলোমিটার দূরে। আর এরোড় হলো কুম্ভকোনম থেকে প্রায় দুশ কিলোমিটার পশ্চিমে। এরোড়ে শশুরের অবস্থাও তথৈবচ; তা হোক। শ্রীনিবাস-কমলাম্মার সংসারে সছলবছল না থাকুক, শান্তি ছিল। সেই শান্তির পরিবেশে শিশু রামানুজন মায়ের কাছে শুনে শুনে শিখলেন বেদ-উপনিষদের শ্লোক, তামিল ধর্মগ্রন্থ তিরুকুরালের সদ্‌বচন। তাছাড়া ঠাকুর্দা-ঠাকুরমার কাছে জানলেন রামায়ণ-মহাভারত আর নানা পুরাণের গল্প। শিশুটির অদ্ভুত স্মরণশক্তি। যা শোনে তাই মনে থাকে। আর সংস্কৃত উচ্চারণও শুদ্ধ ও স্পষ্ট। মা কমলার প্রথম ছেলে, দেবী নামগিরির কাছে মানৎ মানা ছেলে। স্বাভাবিকভাবে অন্য সন্তানের থেকেও মায়ের

কাছে রামানুজনের ঠাঁই অনেক কাছের। তাছাড়া, অদ্ভুত বুদ্ধি আর স্মৃতি শক্তির অধিকারী হলেও কি হবে, ছেলে বড় ন্যালাখ্যাপা ; বড় অন্যমনস্ক প্রকৃতির ; বড় ভালোমানুষ। মা কমলা ছেলে আগলে রাখেন। বাইরে বেশি বেরুতে দিতে চান না। ছেলে ঘরকুনো হোক। তবু মা অথবা ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা চান না রামানুজন বাইরের ডানপিটে ছেলেদের হাতে হেনস্তা হোক। বাবা শ্রীনিবাস সংসারে পোড় খাওয়া মানুষ বলে তিনি চান ছেলে বাইরে ঘুরেটুরে শক্ত পোক্ত হোক। তবু তিনি বাড়িতে আর কতটুকু থাকেন ? সকালে বেরিয়ে ফেরেন সন্ধ্যা শেষে—বাজার হাট বন্ধ হলে। কাজেই শৈশবে রামানুজনের জীবনে যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি হলো—সেটি তাঁর মা-র।

পাঁচ বছর বয়সে বাবা তাঁকে কুম্ভকোনমের এক পাঠশালা, যাকে বলা হতো পিয়াল—সেখানে ভরতি করে দিলেন। সেখনে রামানুজন শিখলেন তামিল অক্ষর পরিচয় আর প্রাথমিক পাটিগণিত। পরে শিখলেন তামিল ভাষার শিশুপাঠ্য কিছু সাহিত্য, আর সংস্কৃত শ্লোক। এখানে, পাঠশালাতেও রামানুজন ভারি শান্তশিষ্ট আর মুখচোরা ছেলে। অন্য ছাত্ররা তাঁর পেছনে লাগে। আবার ভাল অঙ্ক কষতে পারে বলে, তাঁকে দিয়ে নিজেদের অঙ্ক কষিয়েও নেয়। তবে তাঁকে নিয়ে মজা করতে অন্য ছাত্রদের খামতি নেই। রামানুজন অদ্ভুত নিস্পৃহ উদাসীনতার বন্ধুদের অত্যাচার সহ্য করেন। গুরুমশায়কে নালিশ করেন না। কেউ নালিশ করতে বললে আপত্তি করেন, কাঁধ ঝাঁকিয়ে তুচ্ছতা প্রকাশ করেন। ধীরে ধীরে অঙ্কে মাথাআলা শান্ত ছেলেটি বন্ধু এবং গুরুমশায়দের চোখে ভালো লাগার হয়ে উঠতে থাকে। ছেলেটির খেলাধূলায় মন নেই, তবু রসবোধ আছে। হাসতে পারে। কাজেই অন্যের বন্ধু সহজেই হতে সে পারে।

সাত বছর বয়সে 1894 সালে কুম্ভকোনমের টাউন স্কুলে ভর্তি হলেন রামানুজন। আর দশ বছর বয়সে প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় গোটা জেলার মধ্যে প্রথম হলেন। কাজেই স্কুলে তাঁর মাইন হলো হাফ ফ্রি। তাছাড়া ইংরিজি সংস্কৃত আর অঙ্কে ভালো ছাত্র বলে মাস্টারমশায়দের স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। সে যুগের দক্ষিণী ছাত্রদের মতো রামানুজনের স্কুলের পোশাক হলো ধুতি, একটি কালো চেকের কোট আর মাথায়

গোল উঁচু উলের টুপি—যাকে বলা হ'তো হাসান ক্যাপ। খালি মাথায় ক্লাশে ঢোকা ভীষণ দোষের। সেই দোষ রামানুজন একদিন করে বসেন। একদিন ট্রামে চেপে স্কুলে আসার সময় হাওয়ায় টুপি দূরে উড়ে যায়। খুঁজে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত পণ্ডিতের ক্লাশে কাঁচু মাচু মুখে রামানুজন ঢোকেন। পণ্ডিত মশায় ধমকধামক দেন। রামানুজন বলেন, বর্তমানে তাঁর টুপি কেনার পয়সা নেই। কাজেই মাথাখালি থাকছে। খালিমাথায় কিছুদিন ক্লাশ করতে না দিলে, তাঁর পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে যে যাবে! পণ্ডিত মশায় প্রিয় ছাত্রটিকে বিপদে আর ফেলেন না। তাঁর অনুরোধে রামানুজনের খালি মাথায় ক্লাশ করার সাময়িক অনুমতি পাওয়া যায়। মাস্টাররা তাঁকে ভালোবাসেন। তার কারণও ছিল। টাউন স্কুলে দেড় হাজার ছাত্র আর তিরিশের চেয়ে বেশি কিছু শিক্ষক। এই শিক্ষকদের ক্লাশের টাইম-টেবিল করতে হেডমাস্টার ভার দিলেন অঙ্কের মাস্টারকে। তিনি, গণপতি সুব্বায়ার, আবার অঙ্কে মাথাআলা রামানুজনকে ডেকে টাইমটেবিলটা তৈরি করে আনতে বললেন। আশ্চর্য, পরদিনই ছেলেটা চমৎকার এক রুটিন, এক টাইমটেবিল করে এনে দেন। তারপর থেকে টাইমটেবিল করাটা, যতদিন স্কুলে ছিলেন, ততদিন তা ছিল রামানুজনের এক্তিয়ারে।—অঙ্কে বড় পরিস্কার মাথা ছেলেটির। তাছাড়া ইংরিজিতেও ভালো।

নিচু ক্লাশ থেকেই অঙ্কে বিশেষত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। একবার অঙ্কের মাস্টারমশায় জানালেন কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে এক আর যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ইনফিনিটি বা অসীম সংখ্যা। শিশু রামানুজন তৎক্ষণাৎ মাস্টারমশায়কে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যাবে—এক বা ইনফিনিটি? আর একবার গণিতের চরমসত্য (Highest Truth) যে কি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। উপরের ক্লাশের ছাত্ররা কেউ বললে পিথাগোরাসের উপপাদ্য হলো চরম সত্য ; আবার ভুয়োদর্শী বাস্তববাদী একদল বলে স্টকশেয়ারের গণিতই চরম। সব শুনেটুনে রামানুজন চুপচাপ থাকেন। ভাবটা—চরম সত্যের ব্যাপারটা অন্যের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেই খুঁজে পেতে দেখব।—ক্লাশে ট্রিগোনোমিট্রি শেখানো শুরু হলে বইয়ের সব অঙ্ক চটজলদি কষে রামানুজন নাকি অয়লারের সাইন-কোসাইন থিওরেম আবিষ্কার করে ফেলেন। (হার্ডি মনে করেন

এটি সম্ভবত সার্কুলার ও এক্সাপানেনাশিয়াল ফাংশনের সম্পর্ক বোধ।) এর কিছুদিন পরে কলেজের এক বন্ধুর কাছ থেকে লোনির (S. L. Loney) ট্রিগোনোমেট্রি নামের বইটির দ্বিতীয় ভাগটি সংগ্রহ করে দেখেন তাঁর কষা অঙ্কটি অয়লার অনেক আগেই করে রেখেছেন ! লজ্জায় রামানুজন তাঁর অঙ্কের কাগজটি ঘরের বাতায় লুকিয়ে রাখেন। —লোনির বইটি তাঁর কাছে এক নতুন দেশের খবর এনে দেয়। ট্রিগোনোমেট্রি ছাড়া বইটির শেষে ইনফিনিট সিকোয়েন্সের যোগ আর গুণের আলোচনা ছিল। রামানুজন দেখেন, অতি সাধারণ ফর্মুলাটির ভেতর থেকে দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অফুরন্ত টার্ম বেরিয়ে আসতে পারে যাদের বলা হবে ইনফিনিট সিকোয়েন্স। এরই বিশেষ অংশ যোগে বা গুণে নামে। পাওয়া যায় নির্দিষ্ট সসীম পরিচিত রাশি। টার্মদের যোগের পথে পাওয়া যায় সিরিজ আর গুণের পথে প্রোডাক্ট। এই সিরিজ-প্রোডাক্টের অনন্য সৌন্দর্যে রামানুজন মুগ্ধ হয়ে পড়েন। অসীমের পথে কত যে সুনির্দিষ্ট ফোটা ফুলের মেলা।....লোনির বইয়ের আদ্যপ্রান্ত শেষ করে, সব অঙ্ক কষে ফেলে কলেজ পড়ুয়া ছেলেটিকে বইটি ফেরৎ দেন। ফোর্থ ক্লাশের ছেলেটির অঙ্কে জ্ঞান দেখে বিএ ক্লাশে পাঠরত ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর নিজের অঙ্ক নিয়ে রামানুজনের কাছে যখন তখন যেতে তার আর লজ্জাবোধ নেই। আর রামানুজনও তেমন। বিএ ক্লাশের অঙ্ক আর স্কুলের অঙ্কে তফাৎ খুঁজে পান না। একটা আরেকটার চেয়ে সমাধান করতে একটু বেশি সময় নেয়—এই যা ! রামানুজনের বয়স তখন বারো। এই সময়ে গণিতের তিনটি প্রোগ্রেসন বা শ্রেণীকে তিনি কবজা করে নিলেন। মাস্টাররা এই ব্যাতিক্রম, বিস্ময়ের বালকের দিকে চেয়ে থাকেন।

রামানুজনের বয়স যখন পনেরো তখন কলেজের এক ছাত্রের কাছ থেকে লাইব্রেরির একটি বই পেলেন। নাম এ সিনপ্সিস অব এলিমেন্টারি রেজাল্টস ইন পিওর এণ্ড এপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স, লেখক হলেন 'জর্জ শুব্রিজ কার (George Shoobridge Carr)। কার ছিলেন কেম্ব্রিজের গোনভিল এণ্ড কেইনস (Gonville and Cains) কলেজের একজন স্কলার। কলেজে ছাত্রদের এই স্কলারটি পড়াতেন, অঙ্ক কষতে দিতেন। তাদের জন্য কার নানা অঙ্ক তৈরি করেছিলেন। সেইসব অঙ্ক আর সমস্যা নিয়ে কারের ঐ সিনপ্সিস বইটি। বইটি

দুখণ্ডে ছাপা, প্রথম খণ্ড ছাপা হয় 1880 সালে, দ্বিতীয়টি 1886 সালে। এই বইটির একটি কপি কেম্ব্রিজের লাইব্রেরিতে এখনো সযত্নে রাখা আছে—তার কারণ বইটি রামানুজনের বিকাশ উদ্ভাসনের সূত্রপাত, ট্রিগার।

কারের বই আর রামানুজনের উপর তার প্রভাব নিয়ে হার্ডি আলোচনা করেছেন। সে কথা শোনা যাক।—

"বইটি তেমন বিশেষ কিছু নয়, রামানুজনের জন্য এই বই-এর খ্যাতি। সন্দেহ নেই, বইটি তাঁকে প্রভাবিত করেছে, বইটি পড়ে ভবিষ্যতে তাঁর পথ নির্দেশ যেন জনতে পারলেন। এ ধরণের বই-এর বিশেষত্ব নিশ্চয় থাকে। কারের বইটি হতে পারে তেমন উঁচুমাপের নয়, হতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর একটি পাঠ্যপুস্তক ; তবু বইটি লেখার মধ্যে ফুটে ওঠেছিল সহজাত পাণ্ডিত্য আর আগ্রহ, লেখার শৈলীতে ধরা পড়ে স্বকীয়তা। কার লণ্ডনে নিজেই ছিলেন বেসরকারি শিক্ষক, যাকে বলা হয় প্রাইভেট কোচ। যখন বয়স তাঁর 40 তখন কেম্ব্রিজে স্নাতক হতে এলেন। 1880 সালের ট্রাইপোস পরীক্ষায় তিনি ছিলেন দ্বাদশ সংখ্যক সিনিয়র অপটাইম। (অপটাইম [optime] রা ক্লাশ নিতেন)। এই 1880 সালেই তিনি তাঁর বইটির প্রথমখণ্ড প্রকাশ করলেন—যে বই বা লেখকের কথা এতদিনে সকলে ভুলে যেতে পারতো। পারেনি, কারণ রামানুজন তাঁকে সজীব করে রেখেছেন। কাজেই কার যে এক অসামান্য লোক সেখানে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, বইটা হলো কারের শিক্ষকতার নোটের সংক্ষিপ্তসার। কারের ছাত্র হলে ঐ সিনপসিসের বিশেষ ভাগের অঙ্ক কষতে হবে। সেখানে যে বিষয়সূচী তা প্রায় সিডউল 'এ'র বিষয় (1880 সালে কেম্ব্রিজে বিষয়সূচী ঐ রকম হয়তো ছিল) সমস্ত বইটিতে আছে 6165 সমস্যা বা উপপাদ্য—সুন্দর বৈজ্ঞানিক রীতিতে ভাগ করে সাজানো ; আছে সামান্য প্রমাণের রীতি যাকে প্রমাণ না বলে বরং ক্রস রেফারেনস বলাই ভালো। আর এই প্রমাণের অংশটাই বইটিতে বাজে। এই দোষত্রুটি, গুণাগুণ রামানুজনের নিজস্ব নোট বইয়ে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে বলতে গেলে কোনো প্রমাণই নেই। ঐ নোটবইয়ের যে কোনো ছাত্রের নজরে যা প্রথমে ধরা পড়বে, তা হলো বিষয় প্রকাশের রীতি হুবহু কারের অনুকরণ।

"কারের বইয়ের বিভাগ বিষয় মেনে গড়া—এলজেব্রা, ট্রিগোনোমেট্রি, ক্যালকুলাস আর এনালেটিকেল জ্যামিতি। তবু কোনো বিভাগে

বিশদ বর্ণনা, কোথাও আবার সমতার অভাব। বিশেষ করে ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস অংশটির ব্যাপ্তি তো বেশ বেশি, কারণ সেটি আবার কারের প্রিয় বিষয়। আশ্চর্য ঘটনা হলো, কারের উৎসাহ নেই ইলিপটিকেল ফাংশনে—যা আবার রামানুজনের শেষজীবনের কাজ। এই বিষয়টি রামানুজন যেখান থেকেই পড়ুন—সেখানে কার নেই। যা হোক, রামানুজনের মতো আশ্চার্য প্রতিভাকে বিকশিত করতে কার ঠিক হেলাফেলার নয়। রামানুজনের আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার কথা তো ভোলা যায় না।"

জীবনীকার সেশু আয়ার (P. V. Seshu Aiyar) লিখলেন,

"নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল আর রামানুজন অনন্দে ছুটে ভেতরে চলে এলেন। এই বইটিতে তাঁর প্রতিভার নব উন্মেষ। সেখানে যে সব ফর্মুলা-উপপাদ্য লেখা আছে তিনি তাদের প্রমাণে উদ্যগী হলেন। হাতের কাছে যেখানে অন্য কোন বই নেই, সেখানে প্রতিটি সমস্যা-উপপাদ্য তাঁর কাছে যেন এক গবেষণা পত্র। রামনুজন পরে বলেছেন, রাত্রে স্বপ্নে দেবী নামগিরি তাঁকে সম্যস্যার সমাধান জানাতেন। সত্যি, অনেক রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি উত্তর লিখে রাখতেন। পরে, দ্রুত মিলিয়ে দেখতেন উত্তরের সঠিকতা। অথচ যথাযত প্রমাণ সবসময়ে যে দিতে পারতেন তা বলা চলে না।"

সেকালে গণিতের প্রামাণ্য বই বিদেশে প্রকাশ হয়েছে। হুইটাকারের (Whittaker) মডার্ণ এনালিসিস; ব্রমউইচের (Bromwich) ইনফাইনাইট সিরিজ; কার্সল'র (Carslaw) ফুরিয়ার সিরিজ এণ্ড ইনটিগ্রাল; পিয়ার পয়েন্টের (Pierpoint) থিওরি অফ ফাংশনস অফ এ রিয়াল ভেরিয়েবল এবং গিবসনের (Gibson) ক্যালকুলাস বাজারে পাওয়া যায়। এসব বইগুলিতে আধুনিক গণিতের প্রামাণ্য আলোচনা আছে। শুধু ঐসব বই সেদিন ভারতবর্ষে দেখা দেয়নি, অন্তত মাদ্রাজ বা কুম্ভকোনমে তো নয়। তাছাড়া ছিল বিখ্যাত জার্মান ফরাসী গণিতবিদদের নিজের ভাষায় লেখা ততোধিক বিখ্যাত বই। সে বই থাকলেও রামানুজন তা পড়তে পারতেন না। তিনি তামিল সংস্কৃত আর ইংরিজি ছাড়া অন্য কোনো জাতীয় ভাষা জানতেন না। জানতেন, হয়তো বা সামান্য কিছু, তা হলো আন্তর্জাতিক ভাষাগণিত। সেই ভাষার জ্ঞান নিয়ে কারের বই এর সমস্যা সমীকরণ উপপাদ্য কটির উত্তর-সমাধান বের করতে শুরু করলেন। সেই ছ-হাজারের

বেশি প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে খুঁজে পেলেন, সেখানে প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামানো নেই। আছে সোজাসুজি উত্তর পাবার প্রচেষ্টা। তবু প্রমাণ সেখানে আপনা আপনি হাজির হয়। হয়তো সে খুঁতো, হয়তো পরিপূর্ণ নয়। আর এই উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক সমস্যার নতুন রূপ পেলেন, তাদের আবার উত্তর খুঁজলেন, প্রমাণ চাইলেন। এ পথে নিজেই গড়লেন নতুন সমস্যা-উপপাদ্য আর তার সমাধান ও প্রমাণ। এগুলো এবার একটি খাতায় লিখে রাখতে শুরু করলেন। বিখ্যাত রামানুজনের নোট বইয়ের জন্ম হলো। ধাত্রী হলেন কার।

রামানুজন যদি সে আমলের প্রামাণ্য বিখ্যাত বই পড়তে পারতেন তবে কী হতো?—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর বলা যায় না। শুধু বলা যায়, তাঁর নোটবইয়ের স্টাইলে কার থাকতেন না, সেই শৈলী হতো সাবলীল এবং হয়তো বা সহজ সরল। তবু একবার ভাবা যাক, একজন অনন্য ভাষাজ্ঞানী তরুণ প্রতিভাকে একটি ঘরে মিশরীয় প্রাচীন লিপির সব নিদর্শন দিয়ে বন্ধ করে রাখা হলো—উদ্দেশ্য সে শুধু অচেনা লিপিটির পাঠোদ্ধার করবে না, পারবে সেই লিপির সাহায্যে নতুন কিছু লিখতে, সৃষ্টি করতে। কতদিনে সেই কিশোর ভাষাবিদ তা পেরে উঠবে?—না, এই পরীক্ষার কোনো উত্তর জানা নেই, কারণ এ জাতীয় পরীক্ষা কোথাও কখনো কোনো কালে করা হয়নি। —অথচ ভাষাগণিতে সেই পরীক্ষা করা হলো। পনেরো বছরের রামানুজন মহাকালের সেই পরীক্ষায় বসলেন; সসম্মানে উত্তীর্ণও হলেন।

1903 সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসলেন। পাশ করলেন সসম্মানে। গণিত আর ইংরিজি ভাষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পেলেন সুব্রাহ্মণিয়ম বৃত্তি। টাউনস্কুল ছেড়ে কুম্ভকোনমের গভর্ণমেন্ট কলেজে এফ এ পড়তে ভরতি হলেন রামানুজন। তখন তাঁর বয়স ষোল। হাতে কারের বইয়ের সমস্যার সমাধানের কিছু কাগজ আর তাঁর নিজস্ব নোটবই।

———

অধ্যায় ঃ তিন

পূর্বরাগ (1903-1913)

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে পড়তে এলেন রামানুজন। এফ, এ ক্লাসের পাঠ্যবিষয় হিসেবে তাঁকে পড়তে হলো ইংরিজি, গণিত, রোম ও গ্রিক ইতিহাস, ফিজিওলজি এবং ভারতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত। এই অদ্ভুত পাঠ্যবিষয় বা কম্বিনেশনের কারণ হলো কুম্ভকোনমের সরকারি কলেজে এই সব বিষয়ই পড়ানো হতো। অঙ্ক-সংস্কৃত পড়তে চাইলে ফিজিওলজি নিতে হয়। আর ঐ ফিজিওলজি পড়তে প্রথম থেকেই রামানুজনের অনিচ্ছা। সবচেয়ে খারাপ লাগে ব্যবচ্ছেদ বা ডিসেকসন। ব্যাঙ কাটা নামের কাজে গা ঘিনঘিন করে, বমি আসে। জ্যান্ত ব্যাঙকে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে কাটাকুটি করা এক দুর্বিষহ চিন্তা, কাজতো দূরের কথা। তার উপর পড়তে হয় প্রাণীদের পরিপাক ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি ইত্যাদি। একবার ক্লাশ পরীক্ষায় প্রশ্ন এলো পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে। উত্তরের পাতায় কোনো রকমে কয়েকটা আনসান বাক্য লিখে রামানুজন তলায় লিখলেন, হজমের বিষয়ে এ হলো আমার বদহজমী উদ্গার।' তলায় নাম সই করলেন না। তবু রামানুজন ধরা পড়ে যান। লজ্জা লজ্জা মুখে রামানুজন দোষ স্বীকার করেন। তবে ফিজিওলজি পড়া একেবারেই এড়িয়ে গেলেন। শুধু ফিজিওলজি নয়, ইংরিজি সংস্কৃত আর ইতিহাসের বইয়েরও পাতা খোলা হয় না। কারের বইয়ের সমস্যা সমাধান করে চলেছেন। মাথার মধ্যে গজগজ করছে নতুন নতুন গাণিতিক ভাবনা। সেই ভাবনাতে মত্ত হয়ে আছেন তিনি। অঙ্ক কষছেন, সমস্যা গড়ছেন, সমাধান টানছেন আর লিখে রাখছেন তাঁর নোট-বইয়ে। ফলে প্রথম বছরের শেষ পরীক্ষায় ফেল করলেন। দ্বিতীয় বর্ষে প্রোমোশন পেলেন না, স্কলারশিপও কাটা গেল।

লজ্জায় দুঃখে অপমানে রামানুজন ঠিক করলেন অন্য কলেজে যাবেন। এক বন্ধুর পরামর্শে অন্ধ্রপ্রদেশের কোনো এক জায়গায় গেলেন। সেখানের অভিজ্ঞতাও সুখের হলো না। কোথায় যে ঠিক

গিয়েছিলেন আর ঠিক কী যে ঘটেছিল তা কোনোদিন রামানুজন খুলে বলেননি। শুধু কয়েক মাস স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর আবার কুম্ভকোনমের কলেজে এলেন। 1905 সালে টার্ম পরীক্ষা দেবার সময় দেখা গেল তাঁর এটেনডেন্স-উপস্থিতির হার অনেক কম। তিনি ডিসকলেজিয়েট হলেন বলে সে বছর পরীক্ষা দিতে পারলেন না। হতাশ রামানুজন মাদ্রাজে চলে গেলেন। সেখানে বিখ্যাত পচাইয়াপ্পা কলেজে ফাস্ট ইয়ার এফ এ ক্লাসে ভরতি হলেন। রামানুজনের গণিতজ্ঞানের সংবাদ শুনে অধ্যক্ষ ইয়েটস সাহেব **(J. A Yates)** তাঁকে হাফফ্রিতে কলেজে নিলেন। পচাইয়াপ্পা কলেজেও অঙ্ক ছাড়া আর কোনো বিষয়ে রামানুজনের মন নেই। ক্লাশের একেবার শেষ মাথায় এককোণে বসে নিবিষ্ট হয়ে অঙ্ক কষেন। ক্লাশ কামাই করেন না, কারণ একবারের ডিসকলেজিয়েট হবার অভিজ্ঞতা তখনো টাটকা টাটকা স্মৃতিতে আছে। ক্লাশে যান, ঐ পর্যন্ত। সারা ক্লাশ বসে বসে অঙ্ক কষেন। একমাত্র গণিতের অধ্যাপকেরা কখনো কখনো তাঁকে ডেকে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক করতে বলেন। নইলে রামানুজনের উপস্থিতি শুধু হাজিরাখাতায়, ক্লাশের শেষ বেঞ্চে। তিনি যে আছেন তাই যেন বোঝা যায় না। পচাইয়াপ্পা ক্লাশে নিয়মমাফিক নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী ক্লাশে বসার কথা। রামানুজনের পাশে বসতেন রাধাকৃষ্ণন আয়ার। সে একেবারে প্রথমদিকে। তারপর রামানুজন ক্লাশে উপরের কোণটা খুঁজে নিলেন। তা হোক। রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে রামানুজনের ভাব হয়। রাধাকৃষ্ণন স্মৃতি কথায় বললেন, রামানুজন বেশ ফর্সা গোলগাল ছিলেন। চেহারাতে পুরুষালির ছাপের বদলে নরমসরম মেয়েলি ভাব। হাত দুটো গোল, হাতের তালু নরম আর লালচে। মাথাটা বড়। চোখ দুটো বড় না ছোট বোঝা যায় না, তবে ভীষণ জ্বলজ্বলে। যখন নিবিষ্ট হয়ে ভাবছেন চোখের তারা দুটো কেমন যেন হয়ে যেত, মনে হতো তিনি যেন ট্যারা। এমনিতে মুখচোরা। তবে নিজে কথা বেশি না বললেও, অন্যের কথা শুনতে পারেন, গল্পে পরিহাসে হাসতে পারেন, আর যখন জোরে জোরে হাসেন তখন হাতটা মুখের কাছে নিয়ে আসেন, যেন মুখ চেপে ধরতে যাচ্ছেন। গল্প বলতে পারেন, তবে গল্প হলো রামায়ন বা মহাভারতের—যা তিনি শিখেছিলেন ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে। আর হাত দেখা বা জ্যোতিষিবিদ্যাতেও বেশ সরগর। সেটা আবার তিনি নাকি শিখেছিলেন মায়ের

কাছ থেকে।—মোটামুটি কলেজে রামানুজন বিশেষ কেউ না হলেও, অন্তরঙ্গদের কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং ছিলেন।

পচাইয়াপ্পা কলেজে পড়ার কালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রামানুজন। পড়াশোনা বন্ধ রেখে কুম্ভকোনমে ফিরে আসেন। 1906 সাল কেটে যায়। সে বছরও পরীক্ষা দেওয়া হয় না। তাছাড়া পরীক্ষা দেবার কোনো চাড় রামানুজনের নেই। তিনি শুধু অঙ্ক কষেণ, আর অঙ্ক কষেণ। বাবা বড় ছেলেকে বোঝান, ধমক ধামক দেন। বলেন সংসারের দিকে তাকাতে। অঙ্ক তাঁকে ডালভাত জোটাবে না। বরং একটা পাশ দিলে চাকরি পেতে সুবিধে হবে।—একটা পাশ মানে এফ এ পাশ! বাবার কথায় 1907 সালের ডিসেম্বরে প্রাইভেটে এফ এ পরীক্ষা দিতে বসলেন এবং ফেল করলেন। চার বছর কেটে গেল, এফ এ পরীক্ষায় পাশ করা হলো না।—রামানুজন কলেজ শিক্ষায় ইতি টানলেন।

1903 থেকে 1907—এই চার বছর হলো রামানুজনের কলেজ জীবন। যেখানে দুবার তিনি পরীক্ষায় বসতে পারলেন না আর তৃতীয়বারে, প্রাইভেটে এফ এ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলেন। দুটি কলেজে পড়লেন। অঙ্ক ছাড়া কিছুরই চর্চা করলেন না। এই দুই কলেজের লাইব্রেরিতে যে সব গণিতের বই ছিল, সেগুলি কি তিনি দেখেছিলেন?—না, এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানা যায় না। রামানুজনের দুই কলেজি বন্ধু রাধাকৃষ্ণণ আয়ার ও কৃষ্ণস্বামী আয়ার তাঁদের স্মৃতি কথায় সে খবর বলেননি। কৃষ্ণস্বামী তাঁর স্মৃতিকথায় গণিতের অধ্যাপক রামানুজাচারিয়ার সঙ্গে ছাত্র রামানুজনের গণিত নিয়ে কথোপকথনের কথা বলেছেন। বলেন নি, রামানুজনের অঙ্কের বই নিয়ে গণিত চর্চার কথা। তবু একটা সন্দেহ থেকে যায়। স্কুল জীবনে যে ছাত্র কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে লাইব্রেরির বই ধার করে নিয়ে গণিত চর্চা করেছেন, তিনি কলেজের লাইব্রেরির সব গণিত বই হাতের কাছে পেয়েও নেড়েচেরে দেখেননি? কুম্ভকোনম বা মাদ্রাজের কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়ানো হতো। কাজেই সেখানকার লাইব্রেরি থেকে রামানুজন বই চেয়ে নিয়ে পড়লেও সে বই হতো, হার্ডির ভাষায়, তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক। হোক। তবু সেবই সেই গণিত প্রতিভাকে নিশ্চয় কিছু খোরাক জুগিয়েছিল।

এই চারবছরে নোটবইয়ের পাতা ভরে ওঠে। পরিবেশের কোনো ছাপ সেখানে নেই, নেই দারিদ্র্যের, শারীরিক অসুস্থতার, ফেল হবার অসম্মান হীনমন্যতার। সেখানে থাকে জ্যামিতিক স্কোয়ার, কন্টিনিউড ফ্র্যাকশন, সংখ্যাতত্ত্ব, মৌলিক ও জটিল রাশি, সংখ্যার পার্টিশন, ইন্টিগ্রাল ও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস—এইসব যা তাঁর বোধিমননকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যা পশ্চিমের গণিতবিদরা তিন চার-শ বছর ধরে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে সংগ্রহ করে রেখেছেন, তা আবার নতুন করে তিন চার বছরে পুনরাবিষ্কার করলেন ;—কোনো সহায়তা নেই, নেই কোনো সহমর্মী সঙ্গী। একা, একেবারে একা তিনি। তার চারিদিকে শুধু অঙ্কের সমস্যা। শুধু সংখ্যা রাশির ভিড়।—এই সংখ্যারাশিকে খুঁজে পেতে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে নোটবইয়ের খাঁচায় ভরলেন তিনি। এই তিন চার বছরে খোঁজার পথে তিনি নিজেকে সংযত করতে পারলেন, পারলেন কাজে শৃঙ্খলা আনতে। তবু সব সমাধানের প্রমাণ দিলেন না, বিস্তারিত ধাপ দেখালেন না। কারণ, তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি যে কোনো সময়ে প্রমাণ বা ধাপের অনুপুঙ্খটি প্রকাশ করতে সক্ষম। কারণ, সব সমাধানের প্রমাণ তাঁর জানা নেই। তিনি জানেন ওটাই উত্তর। তাঁর মন জানিয়েছে তাঁর জানানো উত্তর সঠিক। ঐখানে, ঐ জানাতে তাঁর সুখ। কারণ, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অজস্র সমস্যা-ধ্যানধারণা শ্রাবণের ধারার মতো মনের পাতে ঝরে পড়ছে। তাদের খাতার পাতায় বিস্তারিত করে লিখে রাখার অবকাশ কোথায় ? গণিত সংক্ষিপ্ত সংবদ্ধ ভাষা। আর রামানুজনের নোটবই আরো সংক্ষিপ্ত, আরো সংহত সংবদ্ধ। ফেলকরা ছাত্রটি তাঁর নিজের গড়া গণিতের মতো ক্রমশ অবোধ্য আর বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তিনি নিঃসঙ্গ নন। চারিদিকে আছে গণিতের ফোটাফুলের মালা—যে ফুল তিনি নিজেই ফোটালেন।

বাবা সংশয় আকুল হয়ে বড়ছেলেকে দেখেন। সংসারের বেহাল অবস্থায় যার সাহায্যে নামার কথা, গণিতের ভিড়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বাইরের জগতের আলোড়ন, আন্দোলন, লজ্জা, অপমান ভুলে একাত্ম হয়ে গণিতে মগ্ন। অথচ সংসারে আছে সাতটি মুখ, আছে তাদের অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের সমস্যা। সেদিকে রামানুজনের দৃষ্টি নেই। সে নিজে তখন গণিতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ, গণিত সৃষ্টি সুখে মগ্ন। রামানুজনের দৃষ্টি সংসারে ফেরাতে, সেদিন যেমন সব ভারতীয়

পিতা-মাতা করে থাকতেন, তাই এক্ষেত্রে করা হলো। 1909 সালে রামানুজনের বিয়ে দেওয়া হলো। ছেলের বয়স বাইশ, আর মেয়ের মাত্র নয়। এককথায় জানকী আম্মা নামের মেয়েটির গৌরীদান হলো। অনেকে বলেন, বিয়ের সময় জানকী আম্মার বয়স ছিল এগারো। তবে 1987 সালে জানকী আম্মা স্বয়ং জানিয়েছেন যে তাঁর বয়স সাতাশি আটাশি। কাজেই 1909 সালে তাঁর বয়স ছিল নয়, যে বয়সটি সেশু আয়ার জানিয়েছেন। রামানুজনের অন্য জীবনীকার সুরেশরামের জানানো এগারো বছর বয়সটি ঠিক নয়।

বালিকা বধূর আবির্ভাবে রামানুজনের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন বদল হয় না। তাছাড়া জানকী 1909 থেকে 1913 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় বাপের বাড়িতে থেকে এলেন। পুজো পার্বনে কখনো বা কুম্ভকোনমে কাটিয়ে গেছেন ঠিকই। তবে তাঁদের এগারো বছর বিবাহিত জীবনে তিনি রামানুজনের কাছে ছিলেন তিন বছরের মতো সময়কাল। 1913 থেকে 1914 খৃস্টাব্দ, আবার 1919 থেকে রামানুজনের মৃত্যুকাল—এইদুটি কালে তাঁরা একত্রে ছিলেন। 1913 থেকে 1919 খৃস্টাব্দে রামানুজন ছিলেন বিদেশে, আর 1909 থেকে 1913 খৃস্টাব্দে জানকী ছিলেন বেশির ভাগ বাপের বাড়ি। তবু বিয়ের পর রামানুজনের একটি চেতনা হয়। স্ত্রীসমেত বাবার ঘাড়ে থাকা যে উচিত নয় সে বোধ তাঁর জাগে। তাঁর রোজগারপত্র করা দরকার, নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। তবে এই দরকারি কাজ যেন তাঁর গণিতচর্চায় ব্যাঘাত না ঘটায়—সেটিও ভাবা দরকার। রামানুজন রোজগার করতে চান ঠিকই, তবে গণিতকে বির্সজন দিয়ে নয়।

1907 সালে অধ্যাপক রামস্বামী আয়ার ভারতীয় গণিত সমাজ বা ইণ্ডিয়ান ম্যাথামেটিকেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন—যে বছর রামানুজন প্রাইভেটে এফ. এ পরীক্ষায় বসেন। রামানুজন ভাবেন, প্রফেসর আয়ারকে তাঁর গবেষণার কাজ দেখালে সোসাইটিতে কোনো এক কাজ হয়তো পাওয়া যাবে। অধ্যাপক আয়ার আবার দক্ষিন আরকট জেলার তিরুকোইলুর মৌজার ডেপুটি কলেকটার ছিলেন। কাজেই অধ্যাপক রামস্বামী আয়ার তাঁকে অন্য কাজও জুটিয়ে দিতে পারেন। কুম্ভকোনম থেকে ট্রেন ধরে বিলুপুরমে ট্রেন পালটে তিরু-কোইলুরে হাজির হলেন রামানুজন। সেখানে অধ্যাপক রামস্বামী

আয়ারের সঙ্গে তাঁর অঙ্কের খাতাপত্র নিয়ে দেখা করলেন। এই দেখা সাক্ষাতের চমৎকার কাল্পনিক এক বর্ণনা রামানুজনের আরেক জীবনীকার অধ্যাপক এম. আর রঙ্গনাথনের লেখা 'রামানুজন, দি ম্যান এণ্ড দি ম্যাথামেটিসিয়ান' গ্রন্থে পাই। রামানুজন রামস্বামীকে তাঁর পারিবারিক পরিচয় দিলেন, জানালেন দারিদ্র্যের কথা এবং তাঁর গবেষণা, তাঁর নোটবই দেখালেন। নোটবই দেখে রামস্বামী তাঁকে কোনো কেরানির কাজ দিতে চাইলেন না। তাঁর মতে সে কাজ হবে প্রতিভার অপচয়। তিনি অধ্যাপক পি. ভি. সেশু আয়ারের কাছে একটি পরিচয় পত্র লিখে রামানুজনকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সেশু আয়ার অন্য দিকে রামানুজনের গুরু। তিনি কুম্ভকোনম সরকারি কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তবে সেদিন তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত। রামস্বামীর চিঠি নিয়ে রামানুজন তাঁর সঙ্গে মাদ্রাজে দেখা করলেন। সেশু আয়ার রামানুজনের নোটবই দেখে বিস্মিত। তাঁর চেষ্টায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একাউণ্ট জেনারেলের অফিসে একটি সাময়িক কাজ জুটে যায়। কিন্তু কয়েক মাস পরে সেই কাজ শেষ হয়। রামানুজন আবার বেকার। এদিকে বাড়ি থেকে টাকা নেবেন না ঠিক করে বসে আছেন। অতএব দৈনিক দুবেলা খাবার জোটে না। বেশি দিনই না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে রাত্রে শুতে যান। উপযুক্ত আহার না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়িআলা রুগিকে নিয়ে ঘাবড়ে যান। সেই দুঃসময়ে রামানুজনের পচাইয়াপ্পা কলেজের বন্ধু রাধাকৃষ্ণন আয়ারের সঙ্গে দেখা হয়। রামানুজন নিজেই একটা গাড়িভাড়া করে রাধাকৃষ্ণনের বাড়িতে কোনোরকমে হাজির হন। সেই বাড়িতে আশ্রয় খাদ্য ও সেবা জোটে। তবে রুগি হিসাবে রামানুজন মোটেই শান্ত শিষ্ট ছিলেন না বলে বন্ধু জানিয়েছেন। অখাদ্য খেতে ও ওষুধ না খেতে তাঁর আগ্রহ বেশি। যা হোক সেবা যত্নে কিছু উন্নতি হলে ডাক্তারের আদেশে রামানুজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো—সঙ্গী হলেন ট্রেনের আর এম এসের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যিনি রাধাকৃষ্ণনদের পারিবারিক বন্ধু। ট্রেনে উঠে অসুস্থ রামানুজন বন্ধুর হাতে দুটি মোটা খাতা দিয়ে বলেন, তাঁর কিছু হলে, খাতা দুটো বন্ধু যেন মাদ্রাজ ক্রিস্টিয়ান কলেজের অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার অথবা বৃটিশ অধ্যাপক এডোয়ার্ড বি. রসকে দেয়।—কিছু ঘটে না। খাতা দুটি পরে রামানুজন ফেরৎ নিয়ে নেন।—একটি খাতা এই কদিনে দুটি খাতায় দাঁড়িয়েছে!—কুম্ভকোনমে

মায়ের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে আবার মাদ্রাজে ত্রিপ্লিকেন অঞ্চলে সামি পিলাই স্ট্রিটে পুরনো ডেরায় উঠলেন। আবার শুরু হলো মনোমত কাজ খোঁজা। কাজ জোটে না। তবে প্রাইভেট ট্যুশনি জোটে। কলেজের ছাত্রদের অঙ্ক শেখাতে আরম্ভ করলেন রামানুজন। সেশু আয়ার সে খবর জেনে বিচলিত হয়ে তাঁকে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর শহরের ডিস্ট্রিক্ট কলেকটার দেওয়ান বাহাদুর আর, রামচন্দ্র রাও এর কাছে পরিচয় পত্র দিয়ে পাঠান। রামচন্দ্র রাও গণিতজ্ঞ। তিনি যদি রামানুজনের গণিত প্রতিভা বুঝে কিছু সাহায্য করেন। 1910 সালের ডিসেম্বর মাসে রামনুজন দেওয়ান বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাতের কথা দেওয়ান বাহাদুর লিপিবদ্ধ করে গেছেন।—

"গণিত সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ আমার এক ভাইপো আমাকে এসে বলে, 'কাকাবাবু, আমার কাছে একজন অতিথি এসেছেন যে শুধু অঙ্ক নিয়েই কথা বলছে। আমি তো কিছুই বুঝছি না ; ওর কথাবার্তায় কিছু সার আছে কিনা একবার দেখবেন।'—গণিতের জ্ঞানে আমার বেশ অহংকার। তাই সেই অতিথি, রামানুজনকে ; আমার কাছে পাঠাতে বললাম। বগলে দোমড়ানো নোটবই নিয়ে একজন ঢুকলো, মাথায় খাটো, মোটা, দাড়ি না কামানো, নোংরা একটি কুশ্রীদর্শন পুরুষ ; চেহারায় একটি শুধু বিশেষত্ব—একজোড়া উজ্জ্বল চোখ। বেশ দরিদ্র যে বোঝা যায়। বাড়ি থেকে মাদ্রাজে পালিয়ে এসেছে, উদ্দেশ্য তাঁর গবেষণার কাজ যাতে চালিয়ে যেতে পারে। সম্মান প্রতিপত্তিতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। সে চায় একটু নিরুদ্বিগ্ন অবসর ; বা অন্যভাবে বলতে, সামান্য কায়িক পরিশ্রমে যদি সাধারণ ভাতকাপড় জুটে যায়, তবে বাকি সময় সে তার স্বপ্ন নিয়ে কাটাতে পারে। বইখুলে লোকটি তার কাজের কিছু অংশ আমাকে বোঝাতে শুরু করলো। তার কাজ যে অসামান্য অসাধারণ সেটা বুঝলাম, তবে আমার জ্ঞান নিয়ে সে কাজের সদাসদ বিচার করতে পারলাম না। মন্তব্য না করে তাকে পরদিন আসতে বললাম। সে এলো। আর সেদিন সে আমার জ্ঞানের গভীরতা ধরে ফেলে তার সহজ সরল কাজগুলো দেখাতে থাকে। সে সব কাজের ধরণধারণ পাঠ্যপুস্তকে আছে, কাজেই তার কাজে যে বিশেষত্ব আছে বুঝতে পারি। তারপর ধাপেধাপে সে আমাকে ইলি-পটিক ইন্টিগ্রাল, হাইপার জ্যামিতিক সিরিজে নিয়ে গিয়ে শেষমেশ যে কাজ সেদিন জগৎসংসার জানেনি—সেই ডাইভারজেন্ট সিরিজ সম্পর্কে

তার তত্ত্বের বিষয় জানিয়ে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী সে চায়। সে বলে যৎসামান্য বৃত্তি, যা দিয়ে খেয়ে পড়ে সে তার গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে।"

রামানুজনের সঙ্গে কথা বলে, তাঁর নোটবই দেখে দেওয়ান বাহাদুর আক্ষরিক অর্থে হতভম্ব হয়ে পড়েন। মফস্বল শহরে নেলোরে কোনো কেরানির কাজ দিয়ে রামানুজনকে আটকে রাখা অর্থহীন। মাদ্রাজের মতো জায়গায়, পরিবেশে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হতে পারে। দেওয়ান বাহাদুর রামানুজনের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্থ করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন, অন্যথায় যে কোনো ভাবে হোক অন্য সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। সেই মুহূর্তে অবশ্য কোনো বৃত্তি বা স্কলারশিপের সম্ভাবনা না দেখে, তিনি নিজের পকেট থেকে রামানুজনকে মাসিক পঁচিশ টাকার বৃত্তি দিতে শুরু করলেন। দু-তিন মাস গেল!—রামানুজন অন্যের কাছ থেকে দান নিতে রাজি হলেন না। তিনি কাজ চান অথবা চান গবেষণার জন্য সরকারি বৃত্তি। দরিদ্র তিনি ঠিকই। তবু অন্যের দানে নিজের ভরণপোষনের অসম্মানটুকু মেনে নিতে রাজি নন। রামানুজনের এই মর্যাদাজ্ঞান দেখে সেশু আয়ার ও রামস্বামী আয়ার তাঁর একটা হিল্লে করতে উঠে পড়ে লাগলেন। অবশেষে একটা মুশকিল আসানের আলো দেখা দেয়। মাদ্রাজ পোর্টট্রাস্টের ম্যানেজার ছিলেন নারায়ণ আয়ার। তিনি আবার ছিলেন ভারতীয় গণিত সমাজের কোষাধক্ষ। তাঁর সঙ্গে রামানুজনের কোনো একসময়ে আলাপ হয়েছে। দুজনে কোনো কোনো গাণিতিক উপপাদ্য-সমস্যা নিয়ে আলোচনাও করেছেন। রামানুজনের গণিত প্রতিভা তিনি জানেন। এই নারায়ণ আয়ারকে সেশু আয়ার আর রামস্বামী আয়ার ধরলেন, রামানুজনের একটা কাজ যদি তিনি জুটিয়ে দেন।

1912 সালের 9ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ পোর্টট্রাস্টের চীফ একাউ-ণ্টেণ্টের কাছে রামানুজন চাকরির জন্য দরখাস্ত দিলেন। অফিস নোটে ম্যানেজার নারায়ণ আয়ার তাঁর গণিত জ্ঞান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখলেন। এমনকি অন্য ম্যানেজার মিঃ মিডলমাস্ট রামানুজনের ইন্টারভিউ নিয়ে তাকে অসাধারণ গণিত জ্ঞানের অধিকারী বলে জানালেন।—রামানুজনের চাকরির অনুমোদন পাওয়া গেল। সেদিনই নিয়োগ পত্র বেরুলো। পঁচিশটাকা মাসমাইনের কেরানির চাকরিতে পয়লা মার্চ থেকে রামানুজনকে যোগ দিতে বলা হলো।

রামানুজন এই পঁচিশটাকার চাকরি গ্রহণ করলেন। শুভানুধ্যায়ীরা হাঁফ ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাঁরা জানেন—এই কাজে কোনো চাপ নেই। রামানুজন তাঁর নিরুদ্বিগ্ন অবসর পাবেন, তাঁর স্বপ্ন সার্থক করতে পারবেন। অন্যদিকে রামানুজন জানেন, এইবার এতদিনে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন, সংসারে সাহায্য করতে পারবেন। আবার পারবেন গণিত নিয়ে নিজস্ব গবেষণা চালিয়ে যেতে। কত স্বস্তি, কত সুখ, কত আনন্দ!—1911 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় গণিত পরিষদের জার্নালে রামানুজনের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে (ভল্যুম III)। প্রবন্ধটি আসলে সেশু আয়ারকে উদ্দেশ্য করে চিঠির আকারে কিছু প্রশ্ন, কিছু আলোচনা, কিছু সমস্যা, কিছুবা সমাধান। সেশু আয়ার চিঠিটি জার্নালে ছাপিয়ে দেন। এই বছরের ডিসেম্বর মাসের জার্নালের সংখ্যায় বেরুলো তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'বারনোলি সংখ্যার কিছু গুনধর্ন (Property)।'—এই প্রবন্ধটি গণিত সমাজে রামানুজনকে পরিচিত করে তোলে। 1912 সালে পত্রিকায় আর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। রামানুজনকে গণিতসমাজ চিনলেন এক ছাইচাপা অগুন বলে। মাদ্রাজের পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান সার ফ্রান্সিস স্প্রিং (Sir Francis Spring) রামানুজন সম্পকে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। শোনা যায়, একবার তাঁকে সই করতে যে ফাইল পাঠানো হলো, সেখানে তিনি নাকি কয়েকটি খোলা পাতায় দুরূহ অঙ্ক কষা দেখেন। ম্যানেজার নারায়ণ আয়ারকে ডেকে জানেন ঐকীর্তি রামানুজন নামের এক সামান্য কেরানির যে কিনা এক অসামান্য গণিতবিদ। সার ফ্রান্সিসের সুনজরে থাকায় রামানুজনকে তেমন কাজকর্ম করতে হতো না। তিনি অঙ্ক নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন।

এইবারে রামানুজন মাদ্রাজের জর্জ টাউনে শৈবমুথাইয়া স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া করলেন। সেখানে থাকতে এলেন স্ত্রী জানকী, মা কমলা আর ঠাকুমা। অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া ছাড়া চারটি মুখে অন্ন জোগাতে হয়। অথচ বেতন পঁচিশ টাকা, 'ট্রাস্ট অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি' তিনি! রোজগার বাড়াতে প্রাইভেট ট্যুশনি শুরু করলেন। আর নিজের কাজের জন্য কুড়িয়ে বাড়িয়ে প্যাকিং কাগজ ইত্যাদি অফিস থেকে আনতেন। এতদিন স্লেটে অঙ্ক কষেছেন, আর সমস্যা সমাধান ফর্মুলার আকারে লিখে রেখেছেন নোট বইয়ে। চাকরি পাবার পর স্লেট ছেড়ে অফিসের ফেলে দেওয়া কাগজের উল্টো পিঠে অঙ্ক কষতে

শুরু করলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। মোটা ভাতকাপড় আর নিরবচ্ছিন্ন অবসরটুকু তিনি চান—সেই অবসরে তিনি অঙ্ক কষবেন! অঙ্কে এমন নিমগ্ন থাকতেন, যে নাওয়া খাওয়ার সময় মনে থাকতো না। কমলা ও জানকী তাঁকে ডেকে ডেকে খাওয়াতে বসাতেন। কোনো কোনোদিন জানকী নিজের হাতে তাঁকে খাইয়েও দিয়েছেন; কারণ অঙ্কে মত্ত রামানুজনের হাত অন্য কিছু করতে চায়নি!

রামানুজনের প্রতিভায় মুগ্ধ সেশু আয়ার। মাদ্রাজের গণ্ডীতে যে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হবে না সেটি বুঝতে পেরে তিনি রামানুজনকে কেম্ব্রিজের ফেলোদের, অধ্যাপকদের কাছে চিঠি লিখতে বললেন। রামানুজন লিখলেন গণিতবিদ বেকার (H.F. Baker) ও পরে গণিত-বিদ হবসনকে (E. W. Hobson)। দুজনেই কেম্ব্রিজের অধ্যাপক। দুজনেই বিনা মন্তব্যে তাঁর চিঠি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন, কারণ সেদিন সারা পৃথিবী থেকে বহু পাগল কেম্ব্রিজে অধ্যাপকদের উদ্দেশ্য করে তাদের গবেষণাপত্র অজস্র ধারায় পাঠিয়ে চলেছে। অধ্যাপকরাও না পড়ে বা চোখ একটু বুলিয়ে ছেঁড়া কাগজের বাস্কেটে সেগুলি সদগতি করে থাকেন।—রামানুজনের ভাগ্যের হেরফের ঘটলো না। তবু অদম্য সেশু আয়ারের কথায় রামানুজন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হার্ডিকে একটি চিঠি লেখেন, সঙ্গে কিঞ্চিতাধিক ষাটটি গণিত-ফর্মুলা। তারিখ 16ই জানুয়ারি 1913। সেদিন মকর সংক্রান্তি। দক্ষিণের এক উৎসব মুখর দিন। রামানুজন হার্ডিকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন।

'মহাশয়
প্রারম্ভেই নিজের পরিচয় জানিয়ে লিখছি যে........'

অধ্যায় চার

আপ্তদূতী (1913-1914)

রামানুজনের চিঠি আর সঙ্গে পাঠানো ফর্মুলা-উপপাদ্য নিয়ে লিটলউড আর হার্ডি চেসরূমে ঢুকে সেইসব অদ্ভুত দর্শন গণিত নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলেন। বেশির ভাগ ফর্মুলা-উপপাদ্য সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়—ওগুলো পুনরাবিষ্কার মাত্র। তবু কয়েকটি ফর্মুলা দুজনকেই ভাবিয়ে তোলে। চিঠিতে রামানুজন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ছোট কতগুলো প্রাইম সংখ্যা থাকতে পারে তার অভিব্যক্তির কথা লিখেছিলেন। তাঁর নিজের করা অভিব্যক্তিটি হলো ঃ-

x-এর ক্ষুদ্র প্রাইম সংখ্যা যা পাওয়া যাবে তা হলো

$$\int_c^x \frac{dt}{\log t} - \frac{1}{2}\int_c^{\sqrt{x}} \frac{dt}{\log t} - \frac{1}{3}\int_c^{\sqrt[3]{x}} \frac{dt}{\log t} - \frac{1}{5}\int^{\sqrt[5]{x}} \frac{dt}{\log t} - \frac{1}{6}\int_c^{\sqrt[6]{x}} \frac{dt}{\log t}$$

যেখানে $C = 1{\cdot}45136380$ (প্রায়)

এই অভিব্যক্তির বা এক্সপ্রেসনের প্রমাণ রামানুজন দিলেন না। অথচ এই অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য কোন কল্পনার ছোওয়ায় ধরা পড়েছে সেটি হার্ডি-লিটলউডের বোধগম্য নয়। এই এক্সপ্রেসন যে শুদ্ধ নয়, সেটি হার্ডি পরে জানিয়েছেন। তাঁর রামানুজনের উপর দেওয়া সুবিখ্যাত বারটি বক্তৃতার একটিতে এনিয়ে আলোচনা করেছেন। এক্সপ্রেসনটির অশুদ্ধতা নয়, যা দুই গণিতবিদদের আশ্চর্য করে তোলে তা হলো রামানুজন ঐ গণিতে রীমানের (Riemnn) বিখ্যাত সিরিজটি ধরতে পারলেন ! রামানুজনের অভিব্যক্তির ভুলের কারণ কমপ্লেক্স ফাংশন থিওরি—যা উনবিংশ শতাব্দীর অবদান—তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব। পরবর্তীকালে হার্ডি অবশ্য এইসব বিষয়ে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে তোলেন। তবু ঐ উপপাদ্য বা থিওরেমের সাহায্যে রামানুজন যে প্রাইম সংখ্যার দ্বারে পৌছুতে যাত্রা

করলেন সেটি এক অসাধারণ কল্পনা। অন্যদিকে, কোনো সাহায্য ছাড়া রীমানের চিন্তাকে যে তিনি স্পর্শ করতে পারলেন সেই চিন্তাটি শুধু কি অসাধারণ ? অনন্য ?

দ্বিতীয় আর একটি ফর্মুলা যেটি রামানুজন প্রথম চিঠির সঙ্গে পাঠালেন তা হলো ঃ

$$\frac{e^{-2\pi/5}}{1+}\ \frac{e^{-2\pi}}{1+}\ \frac{e^{-4\pi}}{1+}\cdots = \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{2}} - \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

লিটলউড-হার্ডি অঙ্কটি কষে তার শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এধরণের গণিত যিনি ভাবতে পারেন—তাঁর গণিত জ্ঞানে সন্দেহ থাকতে পারে না।

রামানুজন নামে পোর্টট্রাস্টের বার্ষিক কুড়ি পাউণ্ডের মাইনের তেইশ বছরের কেরানিটি সুনিশ্চিত ভাবে অঙ্ক জানেন, বোঝেন এবং অঙ্ক নিয়ে ভাবতে পারেন। তিনি একটি গণিত প্রতিভা।

আটই ফ্রেব্রুয়ারি 1913 সালে হার্ডি রামানুজনকে উৎসাহ দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন।

সেই চিঠি পেয়ে রামানুজন সাতাশে ফেব্রুয়ারী হার্ডিকে দ্বিতীয় চিঠি পাঠান। সঙ্গে আবার ষাটটি ফর্মুলা। একুনে দুটি চিঠির সূত্রে তাঁকে একশকুড়ির বেশি ফর্মুলা থিওরেম উপপাদ্য পাঠালেন। দ্বিতীয় চিঠিতে লিখলেন,

'আপনার মধ্যে একজন এমন বন্ধুর খোঁজ পেলাম যিনি আমার শ্রমের বিচার সহানুভূতির সঙ্গে করতে পারেন। আমার কাজে এগিয়ে যেতে এ যে কতই উৎসাহের ! আপনার চিঠিতে আপনি লিখেছেন বিশদ প্রমাণ দেওয়া দরকার ; বলেছেন প্রমাণ-পদ্ধতি আপনাকে জানাতে।....একটা অসীম টার্মের সিরিজের যোগফল বলি ঃ- $1+2+3+4\ldots\ldots = -\frac{1}{12}$—এ হলো আমার তত্ত্ব মোতাবেক পাওয়া। এই উপপাদ্যটি আপনাকে বললে আপনি সরাসরি আমাকে পাগলাগারদের দোর দেখিয়ে দেবেন। ....আমি ঠিক যা বলছি তা হলো আমার ফলাফল গুলো পরীক্ষা করে দেখুন। যদি আপনার সঙ্গে আমার জানানো উত্তর মিলে যায় তবে আমার মৌলিক ধারণার সত্যতা কিছু

অন্তত আপনার সাবাস পাক। .... আমার মস্তিষ্ককে সচল রাখতে আমার খাদ্যের প্রয়োজন আর তা নিয়েই আমার যাবতীয় চিন্তা। আপনার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি ভরা চিঠি পেলে এখানে ইউনিভার্সিটি অথবা সরকারী বৃত্তি পেতে আমার সুবিধা হবে।...."

হার্ডি চিঠি পেলেন। 'মস্তিষ্ককে সচল রাখতে' বাক্যাংশটা তাকে ভাবিয়ে তোলে। তার চেয়ে বেশি ভাবনার সঙ্গে পাঠানো গণিত। একটি সামেসন পাঠালেন

$$1-5.\left(\tfrac{1}{2}\right)^5+9.\left(\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\right)^5-13,\left(\frac{1.3.5}{2.4.6}\right)^5+\ldots=\frac{2}{[\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)^4]}$$

হার্ডি সামেসনটিকে লিজেণ্ডারের **(Lengendre)** পলিনোমিয়েলের সাহায্যে প্রমাণ করলেন। পরে 1924 সালে হুইপল (Whipple) তার সুবিখ্যাত $_7F_6$ থিওরেমের সাহায্যে এটি প্রমাণ করেন। এই সামেসনটি রামানুজনের নোটবইয়ে নেই। এটি রামানুজন হার্ডিকে পাঠাবার জন্য সৃষ্টি করলেন। নোটবইয়ে আছে অন্য একটি থিওরেম যেটি হুইপলের $_7F_6/_4F_3$ থিওরেমের পূর্বসূরী। 1913 সালে রামানুজন যা ভাবলেন তার চৌদ্দবছর পর হুইপল সেই ভাবনার প্রমাণ দিলেন, থিওরেম দিলেন।—তবে সে পরের কথা। হার্ডি সামেসনটিকে প্রমাণ করে বিস্মিত হলেন। আরো বিস্ময় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

প্রথম চিঠির সঙ্গে পাঠানো কন্টিনিউড ফ্র্যাকসন ফর্মুলা যেটি আগে জানানো হলো—সেজাতীয় আরো একটি ফর্মুলা পাঠালেন রামানুজন ;—

$$\frac{e^{-2\pi/\sqrt{5}}}{1+}\;\frac{e^{-2\pi/\sqrt{5}}}{1+}\;\frac{e^{-4\pi\sqrt{5}}}{1+}\cdots\cdots$$

$$=\frac{\sqrt{5}}{1+\sqrt[5]{5^{\frac{3}{4}}[(\sqrt{5-1})/2]^{\frac{5}{2}}-1}}-\frac{\sqrt{5+1}}{2}$$

এই ফর্মুলা প্রমাণ করে হার্ডি সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন। রামানুজনের মধ্যে কোথাও যদি পাগলামো থাকে তবে তা বিরল প্রতিভার বিভাস—যা সেকালীন বিদগ্ধ মানসেও চাঞ্চল্য এনে দিতে পারে। রামানুজন হলেন প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞদের প্রথমসারির একজন।—তাঁকে কি মাদ্রাজে একা ফেলে রাখা যায়? হার্ডি তাঁর বক্তৃতায় পরে বললেন, 'একটি অসম্ভব হ্যাণ্ডিকাপ বা অসুবিধা নিয়ে উনি কাজ করছেন।

সারা ইউরোপে সংগৃহীত জ্ঞানের বিরুদ্ধে একজন দরিদ্র নিঃসঙ্গ হিন্দু তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন। গণিতের অগ্রগতির খোঁজ জানেন না বলে সবকিছু প্রথম থেকে তাঁকে করতে হচ্ছে।"

এবং নেভিল তাঁর বেতার বক্তৃতায় বললেন, "150 বছর আগে ইউরোপীয় গণিতবিদরা তাঁর থেকে আগে যে কাজে নেমেছেন, তিনি ছিলেন সেই অবস্থায়। 1913 সালে তাঁরা যে কোথায় হাজির হয়েছেন তা তাঁর জানা নেই। কাজেই অতি উচ্চ শ্রেণীর গণিতজ্ঞদের সাহচার্য তাঁর দরকার সেদিন—অথচ সেই ধারণা তাঁর নেই। হার্ডি যখন তাঁকে কেম্ব্রিজে আসতে বললেন রামানুজন, আপত্তি জানালেন; কারণ জাত খোয়াতে তিনি চান না। তাছাড়া তাঁর বাবা-মা ধর্মের কারণে আপত্তি তোলেন। হিতৈষী বন্ধুরা দেখলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করে ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বাড়াবার এক বিসদৃশ প্রতারণার সূচনা।"

হার্ডি তাকে কেম্ব্রিজ আনতে চেয়ে বাধা পেলেন। একবগ্‌গা জেদি হার্ডি তবু বাধাবিপত্তি মানতে রাজি নন। রামানুজনের 'না'কে 'হ্যাঁ' করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

মাদ্রাজেও হিতৈষী রামচন্দ্র রাও, সেশু আয়ার, রামস্বামী আয়ার রামানুজনের জন্য স্বদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। রামচন্দ্র রাও মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক গ্রিফিথ সাহবকে (C.L.T. Griffith) রামানুজনের জন্য কিছু একটা করতে অনুরোধ করলেন সেই 1912 সালে। সে বছর বারোই নভেম্বর তারিখে গ্রিফিথ লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক হিলকে (M. G. M. Hill) রামানুজনের কিছু ফর্মুলা পাঠিয়ে চিঠি দিলেন। হিল জবাবে লিখলেন, রামানুজনের গণিত ইনট্যুটিভ; ইনট্যুশন সঞ্জাত। তাঁর কাজ নিশ্চয় ভাবনার উদ্রেক করে। হিলের চিঠির কথা মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়ে।

1913 সালের প্রথমদিকে ভারতীয় আবহতত্ত্ব বিভাগের (Indian Meteorological Dapartment) প্রধান হয়ে এলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কেম্ব্রিজের সিনিয়ার র‍্যাংলার, (Wrangler) ডক্টর গিলবার্ট ওয়াকার (Walker)—যিনি রয়েল সোসাইটির একজন সভ্য। রামানুজনের বড়কর্তা সার ফ্রান্সিস স্প্রিং তাঁর সঙ্গে রামানুজনের বিষয় নিয়ে কথা বললেন। সে কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন।—

"পচিশে ফেব্রুয়ারী 1913 সালে ডক্টর গিলবার্ট ওয়াকার, যিনি একজন প্রখর গণিতবিদ, এবং সিনিয়ার র‍্যাংলার, বর্তমানে ভারতীয় আবহতত্ত্ব বিভাগের প্রধান—তিনি মাদ্রাজ বন্দরের জোয়ার ভাঁটার বীক্ষণ নিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে এলেন। এই সুযোগে শ্রীনারায়ণ আয়ার (যিনি নিজে একজন গণিতবিদ এবং ভারতীয় গণিত সমাজের নির্বাহী সম্পাদক) এর সহায়তায় রামানুজনের কিছু কাজের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ডক্টর গিলবার্ট কিন্তু রামানুজনের কাজের বিচার করতে অসমর্থ বলে জানালেন ; বললেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মিস্টার হার্ডি, তাঁর মতে, এ কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ।—রামানুজন অবশ্য ইতিমধ্যে মিঃ হার্ডির সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে শুরু করেছেন। ডক্টর ওয়াকারের পরিদর্শনের ঠিক সতেরো দিন আগে লেখা আটই ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি চিঠি এই ফাইলে আছে।"

রামানুজন হার্ডির চিঠি নিজের কাছে না রেখে শুভানুধ্যায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছেন ! উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি যদি জোটে ।

পরিদর্শনের পরদিন ছাব্বিশ তারিখে ডক্টর ওয়াকার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে রামানুজনের জন্য বৃত্তির সুপারিশ করে একটি চিঠি পাঠান। চিঠির বয়ান হলো ঃ—

"মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের একাউণ্ট বিভাগের একজন কেরানি—নাম এস রামানুজন, তাঁর ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁকে আমি এখনো দেখিনি ; তবে গতকাল সার ফ্রান্সিস স্প্রিং-এর উপস্থিতিতে তাঁর কিছু কাজ দেখেছি। শুনেছি তাঁর বয়স বাইশ, অথচ তাঁর কাজের যে নির্দশন দেখলাম তাতে বলা যায় সে কাজ যেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোর মৌলিক কাজের সমকক্ষ।....আমার বিশ্বাস কয়েক বছরের জন্য তাঁর ভরনপোষণের দুর্ভাবনা দূর করে, নিশ্চিন্তে পুরো সময়ের জন্য গণিতের কাজে তাঁকে যদি নিযুক্ত করতে পারা যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বাড়বে।"

ডক্টর ওয়াকারের চিঠি, হার্ডির লেখা চিঠি, বিদেশী বিখ্যাত গণিতবিদদের চিঠি নিয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোড়ন জাগে। একপক্ষকাল পরে অধ্যাপক হনুমন্ত রাও পোর্ট ট্রাস্টের ম্যানেজার এবং ভারতীয় গণিত সমাজের সম্পাদককে জানালেন 19শে মার্চ বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় সিনেট হলে গণিত বিভাগের বোর্ড অফ স্টাডিজের

পক্ষ থেকে একটি মিটিং ডাকা হয়েছে—বিষয় হলো রামানুজন। সে মিটিং এ নারায়ণ আয়ারকে উপস্থিত হয়ে সভ্যদের রামানুজন সম্পর্কে জানাতে অনুরোধ করলেন।—কারণ রামানুজনকে নারায়ণ আয়ার যেমন জানেন, তেমন জানেন কম লোকই।

নির্দিষ্ট সময়ে সিনেটে মিটিং হলো। বোর্ড অফ স্টাডিস ডক্টর ওয়াকারের সঙ্গে সহমত হলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান রামানুজনকে মাসিক 75 টাকার একটি বৃত্তি দিতে সুপারিশ করে ভাইস চ্যান্সালরকে চিঠি দিলেন। চিঠির তারিখ পঁচিশে মার্চ, 1913 সাল।

1913 সালটি রামানুজনের জীবনে একটি চিহ্নিত কাল। ষোলই জানুয়ারী তারিখে হার্ডিকে লেখা চিঠি থেকে একটি সম্পর্কের শুরু। আর পঁচিশে মার্চ আরো একটি সম্পর্কের আরম্ভের সূচনা দেখা দেয়। গণিত বিভাগের বোর্ড অফ স্টাডিজের চিঠিটি পেয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টনক নড়ে। সিণ্ডিকেটের মিটিং এ অনেক আলোচনার পর রামানুজনকে পঁচাত্তর টাকার স্কলারশিপ দেওয়ার মঞ্জুরি জোটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিটসে লেখা হলো ঃ—

"মাদ্রাজ আবহদপ্তরের ডিরেক্টার জেনারেলের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী 1913 সালের চিঠি, ক্রমিক সংখ্যা 1-12, পাঠ করা হলো, যেখানে তিনি পোর্ট ট্রাস্ট অফিসের কেরানি এস. রামানুজনের গণিত বিদ্যার মৌলিক কাজের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন যে, কয়েক বছরের জন্য তাঁর ভরন পোষণের দুর্ভাবনা দূর করে, নিশ্চিন্তে পুরো সময়ের জন্য গণিতের কাজে যদি তাঁকে নিযুক্ত করতে পারা যায়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বাড়বে।

"গণিত বিভাগের বোর্ড অফ স্টাডিজের চেয়ারম্যানের পাঁচিশে মার্চ 1913 সালের চিঠিটিও এখানে পাঠ করা হলো ; সেখানে এস. রামানুজনকে মাসিক পঁচাত্তর টাকার একটি বৃত্তি দিতে বোর্ড সুপারিশ করেছে।

"বোর্ডের সুপারিশটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এবং নিগম আইনের (Act of Incorporation) চৌদ্দ সংখক ধারা এবং 1904 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তিন নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার বাহাদুরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি কোষ (Fee

Fund) থেকে মঞ্জুরিকৃত স্কলারশিপটি অনুমোদন করতে অনুরোধ করা হলো।”

বোর্ড শর্ত সাপেক্ষে বৃত্তির সুপারিশ করেছিলেন। সিণ্ডিকেটও শর্ত সাপেক্ষে বৃত্তি মঞ্জুর করলেন। রামানুজনের বৃত্তি লাভের অধিকারী হবার শর্ত হলো, তাঁর কাজ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চতুর্মাসিক রিপোর্ট পেশ করতে তিনি বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় বৃত্তি নাকচ হবে।—সিণ্ডিকেটের মিটিংটি যত শান্ত হবে বলে মনে হয়েছিল, বাস্তবে তা হয়নি। তর্কাতর্কি ওঠে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মাস্টার ডিগ্রি না থাকলে কোনো রিসার্চ ছাত্রকে স্কলারশিপ দেওয়া যায় না। রামানুজন, অন্যদিকে, ম্যাট্রিকুলেশনের দরজা পেরুনো ছাত্র মাত্র। তবে, অন্য আরেকদল জানান, যে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি, সেই আইনটিকে বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ না করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়েরই আছে। এই পরিস্থিতিতে প্রদেশের গভর্নর বা ছোটলাট, যিনি পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার তাঁর বিশেষ অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন।

অতএব সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত জানিয়ে চ্যান্সেলারকে চিঠি দেবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার চিঠিতে সংযোজন করলেন,—

“বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনে বর্তমানে এ জাতীয় বৃত্তি প্রদান করতে পারা যায় না। তবে সিণ্ডিকেট মনে করে নিগম আইনের চৌদ্দ ধারা ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 1904 সালের আইনের তৃতীয় ধারা অনুযায়ী সেণ্টজর্জ ফোর্টের সভাকক্ষে অধিষ্ঠিত গভর্নর বাহাদুরের সক্রিয় অনুমোদনে এই স্কলারশিপ প্রদেয়।”

গভর্নর স্বয়ং অনুমোদন পাঠালেন। রামানুজন স্কলারশিপ পাবার পাকা খবর জেনে পোর্ট ট্রাস্টের কেরানি পদে ইস্তফা দিয়ে পয়লা মে তারিখে পেশাদার গণিতবিদের পদে যোগ দিলেন। এই পেশায় আজীবন কাটিয়ে গেলেন। যে কদিন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁর চতুর্মাসিক রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ে পেশ করে এলেন। প্রথম রিপোর্ট পাঠান পাঁচই আগস্ট 1913 সালে, তারপর সাতই নভেম্বর 1913, সর্বশেষটি নয়ই মার্চ 1914 সালে, ভারতবর্ষ ত্যাগ করার ঠিক এক সপ্তাহ আগে। সর্বমোট তিনটি রিপোর্ট পাঠান—যে রিপোর্টকটি ডঃ গিলবার্ট ওয়াকারের

বক্তব্যের পুর্ণ সমর্থন করছে—এই রিপোর্ট কটি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে এবং আজও করছে।

স্কলারশিপ পেয়ে এই আনন্দ সংবাদ জানালেন হার্ডিকে। সতেরই এপ্রিল 1913 সালের চিঠিতে লিখলেন,

"আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দুই বছরের জন্য বার্ষিক ষাট পাউণ্ডের একটি বৃত্তি প্রদান করতে স্থির করেছে। ভারতীয় আবহতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ ওয়াকার এফ. আর. এস. এর সনির্বন্ধ চেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ আপনাদের আপনি, মিঃ লিটলউড, ডঃ বার্ণেস, মিঃ বেরিকে—যাঁরা আমার সম্পর্কে কৌতূহলী।"

এই স্কলারশিপ পাবার খবরে হার্ডি খুশি হলেন ঠিকই, তবু তিনি জানেন, রামানুজনের স্থান কেম্ব্রিজের গণিত সমাজের মাঝে। মাদ্রাজে তিনি পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হতে পারবেন না। মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তিনি তাঁর জিজ্ঞাসা কৌতূহলের নিবৃত্তি খুঁজে পাবেন না। তিনি আবার—যে কাজ ইউরোপে আগেই হয়ে গেছে—সেই কাজ পুনরাবিষ্কার করে নিজের সময় নষ্ট করে চলবেন। এতে তাঁর শুধু ক্ষতি নয়, ক্ষতি সমগ্র গণিত বিদ্যা গবেষণার।—অথচ রামানুজন দেশ ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাঁর বাবা খুব একটা বাধা নন। বাধা তুলছেন মা—শৈশব থেকে যিনি রামানুজনের আত্মার আত্মীয়। যাঁর কথা তাঁর কাছে বেদবাক্য। তিনি চাননা বিদেশে রামানুজন ধর্ম বিসর্জন দিয়ে থাকবেন। মা কমলা সেদিন রামানুজনের কাছে মাদ্রাজেই আছেন। তাঁর অসম্মতিতে রামানুজন কেম্ব্রিজ যেতে পারেন না।—হার্ডি এই সংকটের একটা কাটানোর চিহ্ন এই সময়ে দেখলেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো, অধ্যাপক নেভিল সে বছর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতি সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে 1914 সালের প্রথমদিকে ভারতবর্ষে যাবেন। নেভিল হার্ডির সতীর্থ। রামানুজন সম্পর্কে হার্ডির কৌতূহল ইন্টারেস্টর খবর তাঁর জানা। রামানুজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কেম্ব্রিজে নিয়ে আসার জন্য নেভিলকে হার্ডি অনুরোধ করলেন। তাঁর ফেরার সময় রামানুজনকে সঙ্গে করে আনা যায় না?—নেভিলের কাছে

এই কাজটা যেন এক চ্যালেঞ্জ !........মাদ্রাজে এলেন নেভিল, দেখা করলেন রামানুজনের সঙ্গে। তারপর যা ঘটলো তা নেভিল স্বয়ং লিখে গেছেন।

"1914 সালের প্রথম দিকের কোনো এক সপ্তাহে আমি মাদ্রাজে এলাম। প্রথম বক্তৃতার পর রামানুজনের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো। দুজনে বসার পর তিনি তাঁর নোটবই পাতা দেখাতে লাগলেন। দুদিন পরে আবার দেখা হলে সেই নোটবই এর পাতা আবার উলটাতে লাগলেন। আমাদের তৃতীয় সাক্ষাতের পর তিনি বললেন, 'ফিরে যাবার সময় এটা আপনি বোধহয় নিয়ে যেতে চান।' এই সশ্রদ্ধ উপহারের উল্লেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঐ অমূল্য পুঁথি কোনোদিন তিনি হাতছাড়া করেন নি। কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এটি বোঝা সম্ভব নয়। কোনো ইউরোপীয়ের হাতে বিশ্বাস করে একে দেওয়া যায় না। মোদ্দা কথা হলো ইংরেজরা ইংরেজ বলেই সন্দেহ যোগ্য নয়; তারা হলো সরকারী যন্ত্রের অংশ। আমি সেই যন্ত্রের বাইরের জগতের লোক বলেই হয়তো আত্যান্তিক সুযোগ লাভের অধিকারী হলাম। নইলে গণিতের অধ্যাপক রিচার্ড লিটল হেইলস (R. Little Hailes) যে সাহায্য মদ্রাজে রামানুজনকে করেছেন সে তুলনায় আমি তুচ্ছ নগন্য—কাজেই আমার এই সুযোগ-প্রাপ্তি সমীচীন বলে মনে করি না।........

"....রামানুজনের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরে কেম্ব্রিজে তাঁর থাবার কথা তুললাম। খুশি হবার মতো খবর শুনি; রামানুজনকে বোঝাবার কোনো দরকার হচ্ছে না। তাঁর বাবামায়ের কোনো অমত নেই। একটি স্বপ্নে রামানুজনকে ইউরোপের লোকের মাঝখানে দেখলেন তাঁর মা। স্পষ্ট শুনলেন দেবী নামগিরি রামানুজনের জীবন ব্রত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাধা না তুলতে আদেশ করছেন। পাছে তাঁকে আবার অন্যকেউ উলটো বোঝায়, তাই আমি নিজেই রামানুজনের হিতৈষী বন্ধুবান্ধবদের বোঝালাম—এই যাত্রা রামানুজনের উপকারের জন্য প্রয়োজনের। সঙ্গে সঙ্গে হার্ডিকে লিখলাম দুস্তর বাধা দূর হয়েছে; তিনি যেন আর্থিক বন্দোবস্তটা ওদিকে দেখেন। আমিও এদিকে মাদ্রাজে সাহায্যের চেষ্টা করব। তবে যদি অসফল হই, ইংলণ্ডে টাকার জোগাড় যেন করা হয়। মনে নেই রামানুজন আর তাঁর নোটবই বিষয়ে কি লিখেছিলাম। মনে আছে রামানুজন যে

যেতে ইচ্ছুক সে কথা জানিয়ে বলেছি আর্থিক কারণে এই যাত্রা কিছুতেই ভেস্তে যেন না যায়। সেই মুহূর্তে হার্ডিকে একটু ইতস্তত করতে দেখলাম। আমাকে তিনি লিখলেন, ভেবেচিন্তে কথা বলো, আগ বাড়িয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিও না। আর লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান অফিস থেকে 'আমরা আগেও এই জাতীয় অদীক্ষিত প্রতিভার কথা শুনেছি"—জাতীয় এক স্মারক লিপি পাঠালেন। হার্ডির সইকরা এ জাতীয় চিঠি আর সাবধান বাণী উপেক্ষা করার কোনো কৃতিত্ব আমি নিচ্ছি না। রামানুজনের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেছি আমি, তার নোটবইও দেখেছি আমি। হার্ডির সে সুযোগ জোটেনি।"

নেভিলের লেখায় কয়েকটি দৃশ্য চমৎকার ফুটে উঠেছে। সামান্য কেরানি, মাত্র ম্যাট্রিক পাশ রামানুজনের কাছে তাঁর নোটবই হলো তাঁর জ্ঞান আর কাজের সার্টিফিকেট। নিজের জন্য নোটবইটি লিখতে শুরু করলেও, এখন 'তাঁর মস্তিষ্ককে সচল রাখার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন' —সেই ভৌত বা মানসিক খাদ্যের তাগিদে সকলকে এটি দেখিয়ে চলেছেন। উদ্দেশ্য আর্থিক দুরবস্থার লাঘব, উদ্দেশ্য তাঁর গবেষণায় সহায়তা সাহায্যের জন্য বিশেষজ্ঞের মন্তব্য-পরামর্শ।

দ্বিতীয় দৃশ্যটি হলো মা কমলার স্বপ্ন—যেখানে তিনি ইউরোপীয়দের মাঝখানে তাঁর ছেলেকে দেখলেন, শুনলেন নালাক্কালের দেবীর আদেশ —রামানুজনের জীবনব্রত সিদ্ধ হবে বিদেশে গেলে। নেভিল এগল্পটি স্বয়ং রামানুজনের কাছে শুনেছেন। আর এই স্বপ্ন দেখার পর রামানুজনের বিদেশে যাবার অনুমতি পাওয়া গেল।

তৃতীয় সংবাদটি হলো লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান অফিসের পাঠানো স্মারক লিপি যেটির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে হার্ডিও একজন। হার্ডি এর আগেই লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রসমাজকে একটি চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কেম্ব্রিজে রামানুজনের শিক্ষা লাভের কোনো সম্ভাবনার প্রয়াসে তারা সাহায্য করতে পারেন কি ? সেদিন এই ব্যাপারে হার্ডি আর অগ্রসর হননি। কারণ রামানুজন বাড়ির আপত্তির জন্য আসতে চাননি। তাছাড়া সেই মুহূর্তে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পাওয়ায় মনে হয়েছিল তাঁর দুশ্চিন্তার মুক্তি ঘটে গেছে। নেভিলের চিঠি পাবার পর হার্ডি আবার ইণ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আর অফিসের কর্মাধক্ষদের সুরে তাল মিলিয়ে সতর্কতার ভান করে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য রামানুজনকে কেম্ব্রিজে আনা—সেখানে কোনো বাধা তিনি

মানতে চান না। আর্থিক বাধাও নয়। নেভিল ঠিকই বলেছেন, তিনি রামানুজনকে প্রত্যক্ষ দেখেন নি, দেখেন নি তাঁর নোটবই। তবে চিঠির সঙ্গে পাঠানো গণিতের ফর্মুলা তিনি দেখেছেন। বাঁশি শুনে মনপ্রাণ দিয়ে আছেন হার্ডি। তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান অফিসের ভারতীয় ছাত্র বিষয়ক সচিবকে একটি পত্র লিখলেন—উদ্দেশ্য ইংলণ্ডে রামানুজনের জন্য সুযোগ্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করা। সেই চিঠি মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিকেটের কাছে আলোচনার জন্য পাঠানো হলো।

1914 সালের আঠাশে জানুয়ারি তারিখ অধ্যাপক নেভিল স্বয়ং একটি স্মারক লিপি পাঠালেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। সেখানে লিখলেন,

"মাদ্রাজে এস রামানুজনের মতো একটি প্রতিভার আবিষ্কার একালের, সারা গণিত জগতের, একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা।………যা সবচেয়ে গুরুত্বের, প্রয়োজনের তা হলো রামানুজনের জন্য গণিতের আধুনিক ধারার পরিশীলিত ট্রেনিং ; যাঁরা বর্তমানে গণিতের বিশাল অববাহিকার তালাস জানেন, জানেন কোন দিকে কীফল কীতত্ত্ব পাওয়া গেছে তাঁদের সাহচর্য………

"পাশ্চাত্যের মহাজ্ঞানী গণিতবিদদের সান্নিধ্যে রামানুজন স্বয়ং বর্ষাস্নাত পুষ্পের মতো বিকশিত হয়ে যে উঠবেন সেখানে আমার সন্দেহ নেই। ফলে গণিত ইতিহাসে তাঁর নাম অন্যতম, বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হবে। এবং মাদ্রাজ শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় অজানার অন্ধকার থেকে যশের আলোয় তাঁকে নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য গর্ব অনুভব করবে।"

উনত্রিশে জানুয়ারি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপক লিটল হেইলস—যিনি রামানুজনের রিসার্চের সহায়তা করছিলেন, তিনি একটি বিরাট চিঠি রেজিস্ট্রারকে লিখলেন—উদ্দেশ্য রামানুজনের বিদেশ যাত্রার জন্য আর্থিক সাহায্য।

আর স্বয়ং গভর্ণরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে এলেন পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, রামানুজনের একদা বড়সাহেব সার ফ্রান্সিস স্প্রিং। স্প্রিং গণিতে বিশেষজ্ঞ নন। তবু রামানুজনের প্রতিভার জন্য তাঁকে স্নেহ করে এসেছেন। এবার স্নেহের পাত্র মানুষটির প্রতিভার বিকাশের জন্য তাঁকে বিদেশে পাঠাতে উঠে পড়ে লাগলেন। গভর্ণরের সঙ্গে

দেখা হবার পর তাঁর সেক্রেটারিকে পাঁচুই ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি চিঠি পাঠালেন। সেখানে লিখলেন,

"আমার জানা সংবাদ সত্য হলে, মহামহিম নিজের হাতে শিক্ষা-বিভাগের কার্যভার রেখেছেন। সুতরাং—কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর গোচরী-ভূত হবে বলে মনে করি এমন একটি বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষন করছি—যে বিষয়টি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি মনেকরি অতি জরুরি। বিষয়টি আমার অফিসের এক ভূতপূর্ব কেরানী, এস রামানুজন সম্পর্কে, যার কথা মহামহিম আমার মুখ থেকে শুনেছেন। গণিতের বিশেষজ্ঞদের ধারণায় এই মানুষটি গণিতের এক নতুনধারার অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং হয়তো বা আলৌকিক প্রতিভার অধিকারী।

"গত আট'ন মাসে কেম্ব্রিজ, সিমলা ও মাদ্রাজের প্রথমশ্রেণীর গণিত বিশেষজ্ঞদল তার কাজ নিয়ে বিচার করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বর্তমানে, মহামহিম অবগত আছেন যে ক্যাম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো, সিনিয়ার র‍্যাঙ্গলার অধ্যাপক নেভিল মাদ্রাজে আনার্স ছাত্র ও কৌতুহলী বিদগ্ধদের কাছে উচ্চগণিতের কোনো এক শাখায় কয়েকটি বক্তৃতা দিতে এসেছেন। কেম্ব্রিজের নির্দেশে তিনি রামানুজন, সম্পর্কে উৎসাহী হন। এখন আশা করছি রামানুজন কেম্ব্রিজে যোগ দিতে রাজি হতে পারেন। দু একবছর কুশলী বিশেষজ্ঞের সহায়তা সেখানে যদি তিনি পান, তবে তার প্রতিভার বিকাশে জগৎ ধনী হবে; তার নিজের যশ সম্মান, ভবিষ্যতের কার্যক্রম, ব্যক্তিগত উন্নতি সবকিছু নিরাপদ হয়ে দাঁড়াবে ;—মাদ্রাজের মতো পশ্চাদপদ অঞ্চলে সারাজীবন থাকলেও এ সম্ভাবনার চিন্তা বাতুলতা মাত্র।

"মহামহিমের সাহায্য ঠিক কোথায় লাগবে সে বিষয়ে আমি সোজাসুজি জানাই। গত সন্ধ্যায় মিঃ লিটল হেইলস ও অন্যান্যদের মুখ থেকে শুনেছি যে রামানুজনের ইংলণ্ডে দুবছর প্রবাসজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট দশহাজার টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে ; অবশ্য এ মঞ্জুরী সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। লিটল হেইলস,-নেভিল ও অন্যান্যদের অবেদন এই যে আমি যেন ঐ অর্থবরাদ্দের দ্রুত অনুমোদনের জন্য মহামহিমের কাছে অনুরোধ করি। আমি কিন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বলতে চাই আমি এই চিঠি সিন্ডেকেটের নির্দেশে লিখছি না ; আমার এই চিঠি একজন সাধারণ নাগরিকের—যে তার কর্মী রামানুজন এবং গণিত নিয়ে উৎসাহী—তার কলমেই লেখা।

মিঃ আর্থার ডেভিস রামানুজনের ইংলন্ডে জলযাত্রার বন্দোবস্থ করবেন শুনেছি, শুনেছি রামানুজনের ধর্মীয় গোঁড়ামি এই যাত্রা পথে বিঘ্নিত হবে না।''''আমার গণিত জ্ঞান এতই যৎসামান্য যে গণিত বিশেষজ্ঞরা যেভাবে রামানুজনের গণিত প্রতিভার বিকাশের ফলে তার নিজস্ব চিন্তাধারায় বিজ্ঞানের নববিকাশের সম্ভাবনার কথা বলেছেন তা বর্ণনায় অক্ষম। তবুও যারা বোঝেন, তাদের মতে তাঁর কাজ হবে যুগান্তকারী। কাজেই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আর্থিক সহায়তাদান হবে যুগোপযোগী ও যথাযথ।''........

সুযোগ্য আমলা ও বৃটেনের বনেদি ঘরের সন্তান সার ফ্রান্সিসের চিঠি উপেক্ষিত হয় না। সেদিনই মহামান্য গভর্ণরের একান্তসচিব চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে সরকার বাহাদুরের নির্দেশ ক্রমে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পয়লা এপ্রিল 1914 সাল থেকে দুবছরের জন্য রামানুজনের নামে বার্ষিক আড়ইশ পাউন্ডের একটি বৃত্তি বরাদ্দ করে। তাছাড়া যাত্রা ও পোশাকের জন্য যথোপযুক্ত ব্যয়-বরাদ্দও মঞ্জুর হয়। ঐ বৃত্তি কিছুদিন পরে দুবছরের বদলে পাঁচ বছরের জন্য প্রদেয় বলে সাব্যস্ত হলো। তাছাড়া, রামানুজন যাত্রাকালে সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার যাতে পান সেই আদেশ বা নির্দেশ স্টিমার কোম্পানির এজেন্টদের কাছে পাঠালেন সার ফ্রাসিস।—হার্ডির ইচ্ছা নেভিলের জনসংযোগের ফলে সফল হয়।

রামানুজন এইসব হইচই থেকে দূরে সরে থেকে লিটল হেইলসের সহায়তায় গণিত নিয়ে মেতে আছেন। শর্তমাফিক বিশ্ববিদ্যালয়কে কোয়ার্টারলি বা চতুর্মাসিক রিপোর্ট পাঠালেন। প্রতিটি রিপোর্টে একটি বিশেষত্ব দেখা যায়—নোটবইয়ের থিওরেম-ফর্মুলার মতো তাঁর রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত ঘনপিনদ্ধ নয়। তিনি দিব্বি এখানে বর্ণনা, প্রমাণ বা মন্তব্য লিখে গেছেন। রিপোর্টের লেখার ধরণটিও সাবলীল—আইনস্টাইনের বিজ্ঞান লেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। বক্তব্য সোজাসুজি বলা। অথচ জটিল বিষয়কে সহজ করে জানানোর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকায় সোজাসুজি বক্তব্য ইনিশিয়েটেড বা ব্রতীদের কাছে সহজ-সরল বলে মনে হয়।—তাঁর প্রথম রিপোর্ট পাঠানো হয় পাঁচই আগস্ট তারিখে, 1913 সালে। সেখানে উপক্রমনিকায় লিখলেন,

“ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারের চিঠির (ক্রমিক সংখ্যা 1631 দিনাংক নয়ই এপ্রিল 1913) দ্বিতীয় প্যারা অনুযায়ী একত্রিশে জুলাই 1913 সালে যে চারটি মাস শেষ হলো-সেই সময়ের চতুর্মাসিক রিপোর্টটি এই সঙ্গে জমা দিচ্ছি।

“ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস বিভাগে আমার আবিষ্কৃত একটি নতুন ফর্মুলা হলো আমার প্রগ্রেস রিপোর্টের বিষয় বস্তু। অনেক ডেফিনিট ইনটিগ্রাল বর্তমানে জানা যাদের মানকে ফাইনাইট বা সান্ত বলে মানা হয়, অথচ প্রচলিত রীতি প্রথা মেনে তাদের নির্ধারণ সম্ভব নয়। আমার এই থিয়োরেম অন্তত এদের অনেকগুলির মান নির্ধারণ করার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারবে। উদাহরণ টেনে বলা যায় এই পেপারের পঞ্চম অনুচ্ছেদের পঞ্চম দৃষ্টান্তটি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক হাডি এমএ, এফ, আর এস, মনে করেন, ‘নতুন ধরণের এবং চিত্তহারী’। তেমনি বেসেলিয়ান (Besselian) ফাংশনের n^{th} অর্ডারের সঙ্গে সংপৃক্ত ইনটিগ্রাল—যাদের নির্ধারণে অনেক জটিল পদ্ধতি বর্তমানে ব্যবহার করা হয়, তারা সহজেই এই পেপারে জানানো থিওরেমের সাহায্যে নির্দেশিত হতে পারে। এছাড়া এই থিওরেমটিকে আমি অনেক ডেফিনিট ইনটিগ্রালের ফাংশনের বিস্তৃতি বা এক্সপানসাণের জন্য ব্যবহার করেছি, যাদের সাধারণত ল্যাগরাঞ্জ, (Lagrange), বুরমান (Burmann) বা আবেলের (Abel) থিয়োরেম দিয়ে আগে কষা হতো। উদাহরণ স্বরূপ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্ত-যা এই পেপারের দ্বিতীয় অংশে বিবৃত, তাদের বিস্তৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করছি।”

“এই থিওরেম নিয়ে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা আমি করেছি তার সবকিছু এই পেপারে বলা নেই। এই থিওরেমের সাহায্যে অনেক নতুন, রোমাঞ্চকর ফলাফল পাবার অভাবনীয় সুযোগ দেখা যায়। এই পেপারে বলা যায়, এই থিওরেমের সাহায্যে যে সব ফলাফল আমি পেয়েছি তার প্রথম কিস্তি জানানো হয়েছে। পরবর্তী রিপোর্টে যে সব নতুন ফলাফল পাওয়া গেছে তাদের অবহিত করবো।

“আমার জীবনের এই প্রথম রিপোর্টটি পেশ করছি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্রমের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা পায়নি, তার রিপোর্টের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি বোর্ডের সভ্যগণ যেন নিজগুণে মার্জনা করে নেন।”

রামানুজনের এই ফর্মুলা বা থিওরেমটি সদ্য আবিষ্কৃত নয়। এটি তিনি আগে আবিষ্কার করে হার্ডিকে জানিয়েছিলেন। এই পেপারে এই থিওরেমের ব্যাপকতাটুকু প্রকাশ করলেন। রামানুজনের প্রথম রিপোর্টটি পাঠকরে মাদ্রাজ ও সিমলার (যেখানে ডক্টর ওয়াকার (walker) ছিলেন) গণিত সমাজ সচকিত হয়ে ওঠে। রামানুজন আরো দুটি পেপার পাঠিয়েছিলেন—যেগুলি তাঁর চতুর্মাসিক রিপোর্ট। প্রতিটি পেপারের মৌলিকত্ব ও অসাধারণত্ব দেশের ও বিদেশের গণিত বিশেষজ্ঞদের চমৎকৃত করে তোলে। প্রথম পেপারটি হাতে পেয়ে হার্ডি তাঁকে কেম্ব্রিজে আনতে দৃঢ়সংকল্পিত হলেন। সে কাজ নেভিলের সহায়তায় শুরু হয়ে গেল।

রামানুজনকে পাঠানো নিয়ে যে সব চিন্তাভাবনা চলেছে, সেদিকে রামানুজনের মনোযোগ নেই। একবার, তখন মোটামুটি তার কেম্ব্রিজ যাবার কথা পাকা, জানকীকে বললেন, ইংলণ্ড থেকে তিনি জানকীর জন্য প্রচুর সোনাদানা হিরে জহরৎ নিয়ে আসবেন। বলে তিনি হাসতে লাগলেন। তার সেই বিখ্যাত জোরে জোরে হেসে ওঠা, মুখের কাছে চাপা দেবার মতো করে হাত রাখা—সেই হাসি! জানকীও হাসেন। তিনি জানেন, রামানুজন বিদেশে যাচ্ছেন তাঁর একমাত্র সহধর্মী সহমর্মী গণিতকে আরো একান্তে পাবেন বলে। সোনাদানার কথা তাঁর মাথায় নেই, সেখানে আছে শুধু গণিত। রামানুজন তাঁর বালিকা বধূর কথা শুনে আরো হাসেন। জানকী বলেন, সোনারূপো তিনি চান না। অর্থের কাঙাল তিনি নন। সারাজগতে রামানুজনের নামযশ ছড়িয়ে যদি পড়ে তবে সেখানেই তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ।

এই সময়ে রামানুজনের তাঁর পরিবারের কথা, তাঁদের দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ে। তাঁর নিকটজনরা তাঁর উন্নতির জন্য সংসার থেকে তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে। তাঁরও কিছু কর্তব্য থাকে। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে কুম্ভকোনমে তাঁর বাবা-মায়ের কাছে তাঁর বৃত্তি থেকে মাসিক ষাট টাকা পাঠাতে অনুরোধ করলেন। রামানুজনের এই অনুরোধটি ইউনিভার্সিটি তৎক্ষণাৎ মেনে নেন। মাদ্রাজের গভর্ণর, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের ইচ্ছায় কোনো বাধা ওঠে না।

17ই মার্চ 1914 সালে এম এস নেভাসা (Nevesa) নামের জাহাজে রামানুজনের যাত্রা স্থির করা হলো। যাবার এক সপ্তাহ আগে

রামানুজন জানকীকে কুম্ভকোনম চলে যেতে বলেন। সে কি? তাঁকে বিদায় জানাতে জাহাজ ঘাটে জানকী থাকবেন না?—না। রামানুজন নিজেকে শেষ বিদায়ের বেলায় বিচলিত হতে দিতে চান না। জানকীকে চোখের সামনে দেখলে তিনি দ্বিধায় বিদীর্ণ হতে পারেন। ক্ষুব্ধ জানকী মৌন হয়ে নিজের জিনিষপত্র আর রামানুজনের ফেলে যাওয়া মালপত্র গোছগাছ করে কুম্ভকোনমে চলে যান। মাদ্রাজের এগমোর স্টেশনে রামানুজন তাঁকে বিদায় দিয়ে আসেন। কথা দেন কেম্ব্রিজ থেকে নিয়মিত তাঁকে চিঠি দেবেন। জানকীও যেন চিঠি দেন। তাঁর চিঠি না পেলে তিনি কিন্তু অস্থির হবেন। এবং সম্ভবত, মাকে কথা দেন, ইংলন্ডে নিরামিষ খাবেন আর ধর্মীয় আচার আচরণ নিত্যকর্ম পদ্ধতি মেনে চলবেন তিনি। তিনি যে বৈষ্ণব আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ—সে কথা বিদেশে ভুলবেন না।

নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ ছাড়ে। মাদ্রাজের সমুদ্রের ঢেউ তাঁকে ইংলন্ডে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে ট্রিনিটি কলেজে তাঁর ঠাঁই স্থির করে রেখেছেন হার্ডি। সেখানে আছে বার্ষিক ষাট পাউন্ডের একটি অতিরিক্ত বৃত্তি। তাছাড়া থাকবে গাণিতিকদের সঙ্গ এবং গণিতের স্পর্শ।

1914 সালের 13ই মে দি হিন্দু পত্রিকায় রামানুজনের পৌঁছ সংবাদ জানিয়ে লেখা হলো,

"মাদ্রাজ শহরের এস রামানুজন উচ্চগণিতে যাঁর কাজ কেম্ব্রিজকে বিস্মিত করেছিল তিনি এখন ট্রিনিটি কলেজের বাসিন্দা। সেখানে তিনি প্রধানত দুই ফেলো হার্ডি ও লিটলউডের সঙ্গে পাঠনিবেশ করবেন। তাঁরা তাঁর করা বিরাট কাজের পর্যালোচনা করে বিস্ময়কর সব তথ্য খুঁজে পাচ্ছেন।"

রামানুজনও গণিতকে ধরতে চাইলেন। এতদিনের এলেমেলো পথে নয়। জনপথে নয়। রাজপথে, সকলের চোখের সামনে।

অধ্যায় ঃ পাঁচ

রসোল্লাস (1913-1918)

1914 সাল। রামানুজন ইংলন্ডে এলেন। সেখানে, বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আরম্ভে কেম্ব্রিজে এলেন। দুজন গণিত বিদের প্রথম দেখা হলো—হাডি আর রামানুজন। রামানুজনের চেয়ে হার্ডি বয়সে দশ বছরের বড়। জন্ম ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখে 1877 সালে। পুরো নাম গডফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি। দুই ভাই বোনের মধ্যে বড় তিনি। বাবা আর মা দুজনেই ছিলেন শিক্ষক। বাড়িতে ছিল গণিতের পরিবেশ। সেই পরিবেশের হাওয়া নিঃশ্বাসে টেনে উইনচেস্টারে স্কুলে পড়ে কেম্ব্রিজে চলে আসেন উচ্চশিক্ষা নিতে। সেখানে ট্রিনিটি কলেজে ফেলো হলেন 1898 থেকে 1919 সাল পর্যন্ত। ঐ কলেজে লেকচারার কাজ পেলেন 1906 সালে। পরে অক্সফোর্ডের সাভিলিয়ান অধ্যাপক হলেন। রামানুজনের কেম্ব্রিজে থাকার কালে, তিনি কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। হার্ডির সান্নিধ্যে রামানুজন অক্সফোর্ডের গণিত বিভাগেও যাতায়াত করলেন। 1919 সালে দুটি ঘটনা ঘটে, হার্ডির ফেলোশিপ শেষ হয় আর রামানুজন ফিরে আসেন মাদ্রাজে, ভারতে। এর কিছু পরে হর্ডি 1928 সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক বা ভিজিটিং প্রফেসার হয়ে আমেরিকায় চলে যান। সেখান থেকে যান কালিফোর্নিয়ার ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজিতে। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইন বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকে এলেন। তবে আইনস্টাইন পুরোপুরি আমেরিকায় আসার আগে হার্ডি 1931 সালে কেম্ব্রিজে ফিরে আসেন শুদ্ধগণিতের স্যাডলেরিয়ান অধ্যাপকের পদ নিয়ে। 1942 সালে এই পদ থেকে অবসর নিলেন। হার্ডি এফ আর এস হন 1910 সালে। আর যেবছরে যে দিনে তাঁকে রয়েল সোসাইটির সর্বশ্রেষ্ঠ পদক কোপলে মেডেল (Copley medal) দেবার কথা সেই 1947 সালের পয়লা ডিসেম্বর তারিখে হাডি মারা যান। দুজন গণিতবিদের সহযোগী হয়ে হার্ডি কাজ করলেন। 1911 সালে কেম্ব্রিজে লিটল উডের সঙ্গে দেখা হবার পর দুজনে দীর্ঘ 35 বছর একত্রে গনিতের নানা পেপার প্রকাশ

করে এলেন। জে নিউম্যান (J. R. Newman) তাঁর 'দি ওয়ার্ল্ড অফ ম্যাথামেটিক্স' গ্রন্থে এই দুজনের সহযোগিতার কথা সপ্রশংশ বাক্যে প্রকাশ করেছেন। আর তারপর বলেছেন হর্ডির অন্য আরেক সঙ্গীর সঙ্গে গবেষণা করার কথা। মাত্র পাঁচবছরের সম্পর্ক। অথচ কত ফলপ্রসূ সেই সময়। হর্ডির এই সঙ্গী হলেন রামানুজন। যাঁর সম্পর্কে জে ক্রাউথার (J. G. Crowther) তাঁর 'শর্ট স্টোরিস অফ সায়েন্স' গ্রন্থে বললেন, 'অন্ধকারের গহ্বর থেকে উত্থান আর তার বিয়োগান্ত সমাপ্তির যে গল্প অমরা রামানুজনের জীবনে দেখি তা বিজ্ঞানের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর ঘটনা। আর চিরকালই তর্ক উঠবে কেম্ব্রিজে তিনি না এলে হয়তো আরো ভালো হতো।'

এই তর্কের শুরু 1914 সালের এপ্রিল-মে মাস থেকে যখন রামানুজন কেম্ব্রিজে এলেন। এসেই কিন্তু আলাদা ঘর পেলেন না। মাস দুয়েক তাঁকে নেভিলের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতে হলো। নেভিল দেখলেন, অপরিচিত পরিবেশে রামানুজন নিজেকে সহজে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। অন্য পোশাক পরতে হয়। জুতো পায়ে রাখা—সে এক ঝকমারি। জীবনের ছাব্বিশ বছর প্রায় খালি পায়ে থাকার পর পায়ের এই বন্ধন দশা মেনে নেওয়া কঠিন। তাছাড়া নিরামিষ খাবার যে খাবেন, তরকারি অন্যধরণের, বিস্বাদ আর পানসে। তবু গণিতবিদদের সংস্পর্শে আসতে পেরে সব অসুবিধা ভুলে যেতে সময় লাগে না। জুলাই মাসে ট্রিনিটি কলেজের লাগোয়া নিজের ঘর পেলেন। সেখানে এককোণে রইলো নিজের হাতে রান্না করার উপকরণ আর কুলুঙ্গিতে নামাক্কালে দেবীর ফটো, ধূপদানী। ইংলন্ডের রামানুজনের চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন নেভিল।—রামানুজন আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ। সাধারণত আয়েঙ্গারদের রঙ ফর্সা। রামানুজনকে কালো না বলে বলা যেতে পারতো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের। সেই রঙ ইংলন্ডের আবহাওয়ায় আরো ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। মাথায় মাঝারি উচ্চতার একটু গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। চেহারা অনুযায়ী মাথাটা বড়। লম্বাচুল উঁচু কপাল ঢেকে বাঁপাশে সিঁথি কেটে আঁচরানো। কান দুটো ছোট ; নাক কিছু থ্যাবরা ; শরীরে যা চোখে পড়ার তা হলো উজ্জ্বল দুটি চোখ ; যে চোখে 1910 সালে একটি নোংরা কুশ্রী চেহারার ছেলের মুখে দেখে-ছিলেন রামচন্দ্র রাও, সেই চোখ আরো তীব্র আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। তাঁর হাঁটার ধরণ কাঠকাঠ ধরণের, মাথা সিধে রেখে দুপা একটু ছড়িয়ে হাঁটতেন। হাতদুটো পাশে একটু ছড়ানো, হাতের তালু

খোলা, নিচে রাখা। কিন্তু যখন কথা বলতেন, সে বসে থাকুন, দাঁড়ানো বা চলার সময় হোক না কেন, হাতের সরু অঙুল সজীব হয়ে মুদ্রা সৃষ্টি করে চলতো—তেমনি তাঁর মুখের পেশিও হতো নমনীয় সংবেদনশীল।—তাঁর হাতের আঙুল আর মুখের ভঙ্গী কতবার কত আলোচনা, কথোপকথনের সময় সজীব চঞ্চল হয়ে যে উঠেছে—সে কথা অনেকেই বলেছেন।

ঠিক যখন নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গণিতের আনন্দে বিভোর হতে যাচ্ছেন, তখন সেই গ্রীষ্মে মহাযুদ্ধ বাধলো। কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের গণিতবিদের দল—যাঁরা রামানুজনকে সাহায্যে করবেন বলে ভাবা হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলে এক এক করে যুদ্ধের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গেলেন। লিটলউড, মর্ডেল, বেরি এবং অন্যান্যরা। হার্ডি গেলে না। তিনি যুদ্ধ পছন্দ করেন না। কাজেই যুদ্ধের কাজে অংশ নেবেন না। নেভিল বললেন, একা হার্ডি। তাঁর কাজ কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডে। তবুও কেমন করে না জানি রামানুজনের জন্য অঢেল সময় দিতে পারতেন তিনি। দুজনকে সবসময়ে একত্রে দেখা যেতো—শ্যামদেশীয় যমজ যেন!—হার্ডির সামনে এক সমস্যা। রামানুজন ভারতীয়। হার্ডি জানেন একজন ভারতীয় আর একজন ইংরেজ সবসময় এক ধরণের চিন্তা ভাবনা করেন না। অন্যদিকে রামানুজন হলেন অর্ধশিক্ষিত ভারতীয়—যিনি এমন কি ভারতীয় শিক্ষাও সম্পূর্ণ পান নি। ভারতবর্ষের কলেজের এফ. এ. পরীক্ষাও পাশ করতে পারেন নি। আধুনিক ইউরোপিয় গণিত বিদ্যা না জেনে ছাব্বিশ বছর গণিতের জটিলতার মধ্যে অনায়াসে ঘোরা-ফেরা করে এসেছেন। এই অদীক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অসাধারণ গণিত জ্ঞানের অধিকারীটিকে গণিতের প্রথাপ্রকরণ শিখিয়ে শৃঙ্খলিত করে সুসমঞ্জস্য কাজের পথে নামাতে হবে। তাড়াহুড়া করলে চলবে না। তাঁর স্বাভাবিক বিকাশে আঘাত দেওয়াও চলবে না। শুধ দক্ষ মালির মতো তাঁর নমনিয়তাকে গণিতশিক্ষার ঠেকা দিয়ে আগলে বাড়তে দিতে হবে—যাতে অজস্র ফল ফলাবার প্রতিশ্রুতিটি অটুট থাকে। হার্ডি বললেন, "আমি তাকে শেখাতে গিয়ে সাফল্য যেমন পেলাম, তেমনি তাঁর কাছ থেকেও শিখলাম অজস্র; যা শেখালাম তার অনেক বেশি!" "সবচেয়ে যা অসুবিধার তা হলো রামানুজন হলে আমার আবিষ্কার। না তাঁকে আমি সৃষ্টি করিনি, উদ্ভাবন (Invent) করিনি। অন্যান্য মহা-পুরুষদের মতো তিনি নিজেই নিজেকে উদ্ভাবন করেছেন। বলা যায়, আমি

হলাম সেই প্রথম কুশলী মানুষ যে তাঁর কাজ দেখার সুযোগ পেয়েছে। সেদিনের কথা এখনো ভাবলে আনন্দ হয়—তাঁর কাজ দেখে তৎক্ষণাৎ জানলাম এক রত্নখনির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।" এই খনির হিরেটিকে সন্তর্পনে, সযত্নে তৈরী করতে হবে—যাতে সে রাজমুকুটে শোভা পায়। বড় কঠিন ধৈর্যের একাজ। বড় আনন্দেরও। 1914 সালের প্রথম দিকে অন্যান্য সতীর্থরা সঙ্গে ছিলেন। 1915 সালের পর থেকে হার্ডি একা। এই একাকী শিক্ষকতার সুফল কতটা?—এই প্রশ্নের উত্তর হার্ডি নিজেই খুঁজে গেছেন। এগারই নভেম্বর 1915 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লিখলেন—

"যুদ্ধ রামানুজনকে অসুবিধেয় ফেলেছে। আমার সঙ্গে যিনি তাঁর শিক্ষকতায় অংশী হতেন, সেই লিটলউড কাছে নেই এবং এই ধরণের উর্বর ছাত্রের পক্ষে একজন শিক্ষক যথেষ্ট নয়।....আজকের যুগে তিনি ভারতীয় গণিতবিদদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ এখানে দ্বিমত নেই।.... বিষয় বাছাবাছি অথবা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর পাগলামো থাকবে।.... তবু প্রশ্নাতীত তাঁর অসাধারণ সহজাতগুণ। অনেক বিষয়ে, আমার দেখা গণিতবিদদের তুলনায় তিনি অনেক বৈশিষ্ঠ্যের অধিকারী।"

এই সহজাত গুণের অধিকারী ছাত্রটি নিয়ে হার্ডির সংকট। তিনি রামানুজনের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে অক্ষম। রামানুজনের চিন্তার বিশাল অববাহিকায় তিনি একটি অঞ্চলে ফসল ফলাতে সক্ষম।

এই হ্যাণ্ডিকাপটি নেভিলের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তিনি লিখলেন, "রামানুজনের প্রকাশিত পেপারের বিষয়বস্তু যদি তাঁর নোট বইয়ের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে থাকে তবে কারণ হলো ভারতে তিনি যে সব ধ্যানধারণা নিয়ে ছিলেন, তার অনেকটাই এখানে উপেক্ষিত হয়েছে, কারণ হার্ডি গণিতের যে বিভাগে পূর্ণ ওয়াকিবহাল সেখানেই রামানুজনকে দ্রুত নিয়ে যেতে পেরেছেন, তাঁর কাজ ফলপ্রসু করতে পেরেছেন। হর্ডির দীক্ষার বাইরে তাঁর নিজস্ব ধ্যানের অন্য অংশে যে সব গণিতবিদ দীক্ষিত ছিলেন সেই গণিতবিদদের সঙ্গ থেকে যুদ্ধ তাঁকে বঞ্চিত করে শুধ হার্ডির কোলেই ঠেলে দেয়। তাঁদের সহযোগিতা এত আত্মিক হয়ে দাঁড়ায় যে দুজনের সম্মিলিত কাজের কোন অংশ যে কার সেটি বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে।"

হার্ডি, মহাভারতীয় অর্থে রামানুজনের সখা হয়ে দাঁড়ান—যেমন কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের সখা। শুধ রামানুজন দ্রোন-শিষ্য অর্জুন নন —তিনি একলব্য! আর হার্ডি তাঁর সখা, বন্ধু উপদেষ্টা ও পথদর্শী।

কীভাবে এই সখা কাজ করেছেন তার উল্লেখে হার্ডি নিজে লিখে গেছেন।

“এক মহাসমস্যার মুখোমখি আমি। আধুনিক গণিত শেখাতে তাঁকে নিয়ে কী করা হবে? তাঁর জ্ঞানের সীমাটি ছোট আবার অন্য দিকে অতলান্তগভীর। এই মানুষটি সহজেই মডুলার ইকুয়েশন অথবা কমপ্লেক্স মালটিপ্লিকেশনের থিওরেম অজানা অর্ডারেও করতে পারেন। কন্টিনিউড ফ্রাকসনে তাঁর দক্ষতা, অন্তত প্রচলিত প্রথানুযায়ী, জগতের যে কোনো গণিতবিদদের ছাড়িয়ে যায়; নিজে স্বয়ং জেটা-ফাংশনের ফ্যাংশনেল ইকুয়েশন খুঁজে পেয়েছেন। এবং সংখ্যা রাশির এনালেটিক তত্ত্বের অনেক সমস্যার বিশিষ্টতম টার্ম—তাও খুঁজে পেয়েছেন। অথচ দ্বৈধ (Doubly) পিরিয়ডিক ফাংশন অথবা কচি’র (Cauchy) থিওরেমের নামও শোনেননি; আর কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের ফাংশন বলতে কী যে বোঝায় সে সম্পর্কে আবছা একটু ধারণা নিয়ে আছেন। গণিতের প্রমাণ বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা অস্পষ্ট। তাঁর সব কাজের ফল—তা নতুন পুরনো যাই কেন হোক না—তা তিনি পেয়েছেন কিছুটা যুক্তির পথে, কিছু বা ইনট্যুশনে, অথবা প্ররোচনায়, আর সে সম্পর্কে কোনো সুসঙ্গত ব্যাখ্যা জানাতে তিনি অক্ষম।

“এই ধরণের মানুষ যিনি, তাঁকে প্রথাগত শিক্ষাক্রমে বাঁধা যায় না। বলা যায় না একেবারে গোড়া থেকে গণিত শিখতে। অন্যদিকে যদি জেদাজেদি করি তবে রামানুজন বিরক্ত হবে; ভয় হয় তাঁর আত্মবিশ্বাস অথবা তাঁর অলৌকিক প্রেরণাকে হয় তো বা নষ্ট করে ফেলতে পারি। অথচ এমন অনেক বিষয় আছে তা না জেনে তিনি থাকতে পারেন না। প্রাইম সংখ্যা বিষয়ে বিশেষ করে তাঁর বেশ কিছু সমাধান ভুল, অথচ ঐ সব সমাধান তাঁর প্রিয়। জেটাফাংশনের সব জিরো যে রিয়েল এ ধরণের চিন্তা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে রাখা যায় না। তব তাঁকে শেখাতে হবে—আর আমি সাফল্যও পেলাম। যদিও যা শেখলাম, তার থেকে অনেক বেশি তাঁর কাছ থেকে শিখলাম। কয়েক বছরের মধ্যে ফাংশনের তত্ত্ব অথবা সংখ্যারাশির এনালেটিক তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করতে পারলেন। তবু তাঁকে আধুনিক স্কুলের গণিতবিদ বলা চলে না।—আর অমনটি হবার তাঁর দরকারও ছিল না। কোনো থিওরেম তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন

কি না পেরেছেন এটি সহজেই তিনি ধরতে পারতেন। তাঁর মৌলিক চিন্তার স্রোতে কোনোদিনই ক্ষীণ হবার চিহ্ন দেখিনি।”

হার্ডি'র সযত্ন সচেতন সহায়তায় রামানুজন বিকশিত হয়ে উঠলেন। লিটলউড বললেন, “একমাত্র সনাতন সংখ্যারাশি তত্ত্ব ছাড়া ফর্মুলার জগতের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে তাঁর পদচিহ্ন পড়েনি—সবখানে অভাবনীয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে তিনি দিলেন। তাঁর কাজের ফলাফল সুন্দর, অনন্য, আবার যেন অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত। অস্বাভাবিক যত বেছে নেওয়া জিনিসের থেকেও তারা যেন আরো অস্বাভাবিক ; আমাদের আকাঙ্ক্ষা যেন চূড়ো ছুঁতে পারেনা। মধুর বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠকরা বিহ্বলতার অভিঘাতও পাবেন।”

একজন একাদমিক আধুনিক গণিতবিদ ও আরেকজন স্বশিক্ষিত প্রতিভার মিলন ঘটলো কেম্ব্রিজে। রামানুজন চেহারায় মাঝারি, আর হার্ডি সুন্দর দেহ সৌষ্ঠরের অধিকারী। রামানুজন ভারতীয় ঐতিহ্যের মানুষ, হার্ডি মুক্ত চিন্তাবিদ, সংস্কারমুক্ত, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। দুজনেই কিছুটা যেন পাগল। রামানুজনের পাগলামো তাঁর গণিত-চিন্তায় আর হার্ডি ঈশ্বরকে তাঁর শত্রু বলে মনে করেন, যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। ফলিত গণিতকে হার্ডি সহ্য করতে পারেন না—কারণ সেই গণিতের সাহায্যে যুদ্ধের অস্ত্র শাণিত থেকে শাণিততর হয়ে চলেছে। ফলিতগণিত তাঁর কাছে অসহ্য রকমের কুৎসিৎ, দুঃসহ ধরণের মূর্খতা ! দুইজনের পাগলামো ধীরে ধীরে দুজনকেই প্রভাবান্বিত করে তোলে। হার্ডি, যিনি ক্রিকেট ভালোবাসতেন, তিনি গণিতে মগ্ন হলেন। তাঁর কাজের প্রভাব পড়ে এনালেটিক গণিতে। নতুন পদ্ধতি, তত্ত্ব অথবা প্রকরণ গণিতের আঙিনায় হাজির হলেন তিনি। আর রামানুজন হার্ডির মতো যুদ্ধের বিরুদ্ধে রইলেন। লিটলউডের অনুরোধেও যুদ্ধের কাজে গণিতের ব্যবহার করলেন না। হার্ডির মতো রাজনৈতিক মতবাদে মানলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেলকে। এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রথাপ্রকরণ মেনে চলেলেও মনের দিক দিয়ে তাঁর সংস্কার মুক্তি ঘটে যায়।

কেম্ব্রিজে রামানুজন কাজে ডুবে গেলেন। সাধারণত কাজ করতেন নিঃস্তব্ধ রাত্রে। বাইরে পোশাক পরিচ্ছদে ইংরেজ হলেও ঘরে ঢকে জুতো খুলে ফেলতেন, রাঁধতেন লুঙ্গি পরে আর সকালে বা সন্ধ্যায় ঘরে থাকলে ললাটে ধূপের তিলক আঁকতেন। খেতেন নিরামিষ। নিজের হাতে নিজের জন্য রান্না বলে সেই রান্না হতো

দায়সারা গোছের। অথচ নিরামিষ রান্না ইচ্ছে হলে ভালো রাঁধতেন। খাওয়াদাওয়া যেমন তেমন, অনেকদিন রাঁধতে সময় পেতেন না। অনশন বা অর্ধাশনে অভ্যস্ত তিনি। একবার এক ভারতীয়ের পরামর্শে কলেজ ক্যান্টিন থেকে আলুভাজা আনতে শুরু করলেন। পরে শুনলেন, ইংলন্ডে ভাজাভুজির মাধ্যম হলো লার্ড বা চর্বি। তারপর থেকে বাইরের খাবার তিনি খান না। ডিম পেঁয়াজ রসুন, এমনকি টোম্যাটো তাঁর খাদ্যতালিকার বাইরে। কফি খেতেন। তবে ইউরোপের কফির স্বাদও আলাদা। কেম্ব্রিজের বন্ধবান্ধুবরা তাঁর জন্য ভালোচাল, তরকারি বা দুধ জোগাড় করে আনতেন—তবে রাঁধতেন নিজের হাতে বলে সে সবের সদ্‌গতি সবদিন হতো না। এমনিতে অড্ডাবাজ নন। তবে মনের মতো সঙ্গী পেলে টুকটাক গল্পসল্প করেন। স্বভাবে শিশু সুলভ ভাব কাটেনি। হঠাৎ অভিমানে মুখভার করে থাকেন। ভারতীয় মজলিস বা ইণ্ডিয়া অফিসের মিটিং ইত্যাদি থেকে দূরে অঙক নিয়েই থাকলেন। রামানুজন নিশ্চিত অন্তর্মুখী। অথচ হার্ডি খেলাধূলা করেন, ভালবাসেন। অবিবাহিত হলেও সামাজিক মানুষ তিনি। দুজন অসম বন্ধু একযোগে কাজ করে গেলেন।

কেম্ব্রিজের ছাত্ররা দুঘরের এক আস্তানা পেতেন। রামানুজনের ছিল তিনঘরের আস্তানা। একটি তার রান্না ও ঠাকুরঘর। আর দুটি ঘরে শোয়া বসা, পড়াশোনা। কেম্ব্রিজে তাঁর অনেক পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, তব গণিতের সমস্যাসমাধানে তাঁর পদ্ধতি আর হাতিয়ারের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনা। তিনি চিরকাল কুম্ভকোনমের রামানুজন থেকে গেলেন। পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হার্ডি বললেন,

"রামানুজনের করা বেশিরভাগ কাজই পুনরাবিষ্কার বলে যে প্রমাণিত হবে সেখানে সন্দেহ নেই। একটি অসম্ভব হ্যাণ্ডিকাপ নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন, সারা ইউরোপের সংকলিত জ্ঞানের বিরুদ্ধে একজন নিসঃঙ্গ দরিদ্র হিন্দুর অসম লড়াই যেন। সত্যিকারের শিক্ষা তিনি পান নি ; ভারতে এমন কেউ ছিলেন না যাঁর কাছ থেকে তিনি কিছু শিখতে পারতেন। জীবনের একটাসময়ে মাদ্রাজের লাইব্রেরির দ্বার তাঁর জন্য খোলা ছিল ঠিকই তবে সেই লাইব্রেরি হলো চলনসই। সামান্য কিছু ফরাসি জার্মান বই সেখানে ছিল, তবে ঐ দুভাষার ক-অক্ষরও তিনি জানতেন না। আমার হিসেবে ভারতে তাঁর কাজের দুই তৃতীয়াংশ কাজই হলো পুনরাবিষ্কার। আর বেশির ভাগ তাঁর

জীবনদশায় প্রকাশ পায়নি। অবশ্য ওয়াটসন, যিনি তাঁর নোটবই এর সম্পাদনা গবেষণা করেছেন, তিনি এর অনেকটা উদ্ধার করে প্রাকাশ করেছেন।........

....রামানুজনের প্রকাশিত কাজের বেশিটাই ইংলন্ডের কাজ। তাঁর মন তখন সুস্থির কিছুটা। তবু কোনোদিনই তাঁকে 'প্রথাসিদ্ধ নিষ্ঠাবান' গণিতবিদ বলা চলে না। অথচ নতুন কাজ করতে পারেন তিনি, আর তা করতেনও চমৎকার। নিয়ম বেঁধে তাঁকে কিছু শেখানো অসম্ভব ছিল, তবে ধীরে ধীরে নতুন চিন্তাধারায় মজতে পারলেন। বিশেষ করে বলতে পারি, প্রমাণ যে কী তা তিনি শিখলেন। তাঁর শেষের গবেষণাপত্রগুলো আগের মতোই অদ্ভুত আর স্বকীয়তাভরা হলেও পড়লে মনে হবে এ যেন এক বিদগ্ধ গাণিতিকের গবেষণা কাজ। তবু তাঁর পদ্ধতি-প্রকরণ একই থেকে গেল। তাঁর মতো আচারনিষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে লোকে হয়তো ভাবতে পারে কচি'র থিওরেমের সাহায্যে তাঁর বিকাশ অনেক প্রকট হতে পারতো। অথচ, সত্যি বলতে, তিনি কচির থিওরেম আদপে ব্যবহারই করেন নি। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো এই বিস্ময়কর লৌকিক প্রতিভার তার দরকারই হয়নি।"

আধুনিক গণিতের প্রথাপ্রকরণ না জেনে তিনি আধুনিক চিন্তার বাইরেও পা রাখতে যে পারলেন, সেটি লিটলউডের কাছে অবোধ্য। কেম্ব্রিজে সকলে তাঁর কাজের 'পরিধি, বৈচিত্র্য আর শক্তি' দেখে মুগ্ধ। তবু যেভাবে তিনি সমস্যার মোকাবেলা করেন তা লিটলউড বুঝতে পারেন না। তিনি বললেন,

"কারের বই থেকে পথের হদিশ পেলেও, তাঁর পদ্ধতিতে এর ছাপ নেই। সেখানে যা সবার আগে চোখে পড়ে তা তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিকতা। তাঁর ইনট্যুশনে ধরা পড়তো আনুরূপ্য—হয়তো তা জোর করে টানা ; আর বিশেষ সংখ্যাসূচক ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিচারের আশ্চর্য আবেশ! কচি'র থিওরেম না জানায় বেশির ভাগ পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবে তিনি ডাবল ইনটিগ্রালের রূপান্তর প্রক্রিয়া (ট্রানসফরমেশন) অথবা বিলোম ক্রিয়ার (ইনভারশন) সাহায্য নিয়েছেন। তবে তাঁর কাজে যে প্রকরণটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তাহলো ডাইভারজেণ্ট সিরিজ ও ইনটিগ্রালের সাহায্যে রূপান্তরের একটি বিশদ

কৌশল বা টেকনিক! (এ ধরণের পদ্ধতি আগে জানা থাকলেও, এটি তিনি আবার স্বাধীনভাবে খুঁজে পেলেন।) তাঁর নিজের পদ্ধতির কোনো উপযুক্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। কঠোর নিয়মাবনুতিতায় তাঁর মন নেই, অবশ্য স্নাতক পূর্বকালের পরে এনালিসিস বা বিশ্লেষণের বিশেষ কোনো উপযোগিতা নেই, কারণ যে কোনো সঠিক ধারণার সে জাতীয় বিশ্লেষণ কুশলী পেশাদার করতে সক্ষম। বর্তমানে প্রমাণ বলতে যে জাতীয় ধারণার কথা ভাবা হয়, সেই ধারণা তাঁর আদৌ ছিল বলে মনে হয় না। কোথাও যদি সামান্য—উল্লেখযোগ্য যুক্তি খুঁজে পেতেন এবং কিছু প্রমাণ ও ইনট্যুশনের সাহায্যে সমাধানটি যদি মনে হতো সঠিক, তবে সেখানেই তাঁর খোঁজার শেষ। তাঁর সহজাতগুণের পক্ষে কচির থিওরেম ব্যাবহার না করাটা তবু সামান্য ক্ষতি বলা যায়। এই প্রকরণটি হাতে নিয়ে তাঁর নানা গবেষণার কাজ হয়তো সহজে দ্রুত তিনি করতে পারতেন ঠিকই; তবে তাঁর নিজের পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণাক্ষেত্রে একই উপলব্ধি ও ব্যাপকতা নিয়ে বিচরন করতে পেরেছেন।"

কেম্বিব্রজেও রামানুজনের স্বকীয়তা প্রকাশ পেল—পেল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তাঁর কাজের পদ্ধতিতে, প্রকরণে। এ সব ধারকরা নয়। এরা তার নিজস্ব। ইংলন্ডে পাঁচবছর থাকার সময় সাতাশটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন তিনি, তার মধ্যে সাতটি হার্ডির সহ-যোগিতায়। একেকটি পেপার অনাবিস্কৃত রহস্যের দ্বার খুলে দিল। প্রফেসার মর্ডেল (L. J. Mordell F. R. S.) যিনি রামানুজনকে কেম্বিব্রজে দেখেছেন, তাঁর গবেষণার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন নিজের পেপারে, তিনিও রামানুজনের কাজের পদ্ধতি বুঝলেন না। তাঁর মতে, রামানুজনের পদ্ধতি হলো রামানুজনেরই পদ্ধতি। জগতে আর কোনো গণিতবিদ নিজের ইনট্যুশনের উপর এতো নির্ভর করেন নি। নিজের জ্ঞানের অংশকে উত্তরোত্তর বিস্তৃত শানিত করে গণিত গবেষকরা সুফল পেয়েছেন। আবার বলা যায় ট্রাডিশনের পথ ভেঙে, সে দিনের চিন্তাপদ্ধতি ভুলে থেকেও কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করা চলে। কাজেই, গণিতের আধুনিক প্রথাপ্রকরণ পদ্ধতি জানলে রামানুজন যে আরো বেশি আরো উন্নত কাজ করতেন, সে কথা অন্তত রামানুজনের বিষয় মানা কঠিন। মডলে তা মনে করেন না। তিনি লিখলেন,

"ইলিপটিক ও মডুলার ফাংশন অংশে রামানুজনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি দেখা যায়। এইখানে তাঁর অসাধারণ ও দীপ্ত প্রতিভা আশ্চর্য

কল্পনা, ইনট্যুশন ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিকশিত হতে পেরেছে। অয়লার ও জেকবির পরে ইনফাইনাইট প্রোসেসের বৈধ ব্যাবহারে ও এলজেব্রিয় ফর্মুলা সম্পর্কে সহজাত ধারণায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অসম্ভব অদ্ভুত আশ্চর্য সমাধান প্রকাশে তাঁর যে সৃষ্টি ক্ষমতা তা মৃত্যু শুধু থামাতে পেরেছে।"

হার্ডিও তাঁকে জেকবি ও অয়লারের সঙ্গে তুলনা করলেন। তাঁর ধারণায় এলজাব্রিয় ফর্মুলা, ইনফাইনিট সিরিজের রূপান্তর ইত্যাদি বিভাগে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি গভীর। এই বিভাগে রামানুজনের তুলনা হার্ডির চোখে পড়েনি। একমাত্র জেকবি ও অয়লারের সঙ্গে তাঁর তুলনা টানা যায়। যে কোনো আধুনিক গাণিতিকদের তুলনায়, তাঁর কাজের বিস্তৃতি অনেক বেশি। সংখ্যারাশি বিভাগে তাঁর যে কাজ তা যেন ভাবাবিষ্ট হয়ে করা। পার্টিশনের ধর্মকেও ঐ আবিষ্ট হয়ে যেন ধরেছেন। আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, ধৈর্য, আর গণনাকরার অপূর্ব শক্তির ফলে তিনি যেন সাধারণভাবে সবকিছুর বিমূর্ত আকৃতিও মনে ছুঁতে পারতেন। নিজের তত্ত্বের বা ধারণার দ্রুত পরিমার্জনের এই বিস্ময়কর ক্ষমতা সেদিন অন্য কোনো গণিতবিদদের ছিল না। অয়লার আর জেকবি, নিশ্চয়, তাঁর তুলনা !

বলা যায় গণিতের ইতিহাসে তিনজন বিশিষ্ট এলগোরিস্ট দেখা দিয়েছেন। এলগোরিস্ট (Algorist) সেই গণিতজ্ঞের দল যারা সমস্যা সংকুল গণিতের অরণ্যে এলজেব্রার প্রতীকী রূপ টেনে জনপথ গড়তে পারেন। তাঁদের চোখে কঠিনতম সমস্যার সমাধান সহজেই ভেসে ওঠে। সমীকরণের ছককে নানা ফাংশনের রীতিতে সাজিয়ে জটিলতাকে মুছে সারল্য আনতে পারেন তাঁরা। অথচ বিশ্লেষণের শ্রমসিদ্ধ রীতি বাদ দিয়েও তাঁরা ফর্মুলার আকার গড়তে পারেন। বিশেষ করে যুক্তির পথ এড়িয়ে ইনট্যুশনের পথে জানতে পারেন আসল ফর্মুলা কোনটা হবে। এলগোরিস্টরা এলজেব্রার পথে-চলা গণিতবিদ যারা ফর্মুলা বিশারদ। তাঁদের ভুলত্রুটিগুলোও ভবিষ্যতে গণিতবিদদের পথদর্শী হয়ে ধরা দেয়। ভুলও জানায় নতুন ইঙ্গিত। সবার উপরে এই গণিতবিদরা তাঁদের ফর্মুলা গঠনে ইনট্যুশনকে বাদ দেন না। এলগোরিস্টের বর্ণনা রামানুজনে খাটে। অয়লার ও জেকবিও এলগোরিস্ট।

গণিতের ইতিহাসে এই ত্রয়ী এলগোরিস্ট তিনটি শতাব্দীতে হাজির হয়েছিলেন। লেনার্ড অয়লার (1707-1783) হলেন অষ্টাদশ

শতাব্দীর মানুষ ; কার্ল গুস্তাভ জেকব জেকবি (1804-1851) উনিশ শতকের গণিতবিদ এবং শ্রীনিবাস রামানুজন (1887-1920) জন্ম হিসেবে উনিশ শতকের মানুষ হলেও তাঁর গবেষণা কাজ বিশ শতাব্দীতে 1907 থেকে 1920 সালে। তিনজনের তুলনা টানা যায় ?

অয়লার সুইজারল্যাণ্ডের মানুষ ; 15ই এপ্রিল 1707 সালে প্রোটেস্টান্ট পদরির ঘরে তাঁর জন্ম। বাবার ইচ্ছেমত ধর্মশাস্ত্র পড়তে শুরু করে অঙ্কে মেতে গেলেন। 1927 সালে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অধার্মিক মতবাদের জন্য অধ্যাপকত্বের পদটি পেয়েও হারিয়ে রাশিয়ায় চলে এলেন। সেখানে সেন্টপিটাসবার্গে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডানিয়েল ও বার্নোলির সাহচার্যে সুখে আনন্দে অঙ্ক নিয়ে, আক্ষরিক অর্থে, ঘর করলেন। চোখের মাথাও খেলেন। 1738 সালে তাঁর ডান চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তার আগে নিউটনের জ্যামিতির রূপে জানানো গতিশাস্ত্র ডাইনামিক্সকে এলজেব্রার ভাষায় মেকানিকা (Mechanica) নামক গ্রন্থে 1736 সালে রূপায়ন করলেন।

মহান ফ্রেদরিখের আমন্ত্রণে অয়লার 1741 সালে বার্লিনে এসে পঁচিশ বছর কাটালেন। এই সময়ে বিখ্যাত কবি গ্যেটের মতো তিনি শাসনকার্যে অংশী হলেন। আবার বার্লিন ও সেন্টপিটাসবার্গের গবেষক উপদেষ্টা হয়ে রইলেন। বার্লিনে অয়লার দুশোর বেশি নিবন্ধ, তিনটি এনালিসিসের উপর গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। তাছাড়া প্রকাশ করেন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'জার্মান রাজকুমারীকে লেখা চিঠি'। 1766 সালে বার্লিনের শাসকদের সঙ্গে ধর্ম আর দর্শন বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ ঘটায় অয়লার আবার রাশিয়ায় চলে এলেন। জার্মানরা তাঁকে আড়ালে ডাকতো অঙ্কের সাইক্লপস—অঙ্কের এক চোখো দৈত্য। এই অঙ্কের এক চোখো দৈত্যটি 1771 সালে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে পড়েন। তবু অন্ধত্ব তাঁর মৌলিক কাজে ঘাটতি ঘটাতে পারে না। অপটিক্স, এলজেব্রা, চাঁদের গতিপথ নিয়ে তাঁর আলোচনার প্রকাশ এই সময়ে। অনেক কাজ করেছিলেন অয়লার। শোনা যায় তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও তাঁর তখনো অপ্রকাশিত নিবন্ধ সেন্টপিটাসবার্গের কমেন্টারি (Commentarii) নামের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে এলো।

এনালিসিস বিভাগে অয়ালারের মূল কাজ থাকলেও তাঁর কাজের পরিধি বিরাট। ফাংশনের সংজ্ঞা দিলেন তিনি। যদিও এই সংজ্ঞাটিকে বর্তমানে খুঁতো বলে ধরা হয়, তবু ফাংশনের ধারণা, প্রতীক ও

বিশ্লেষণ তাঁরই সৃষ্টি। ত্রিকোনমিতি ও লগারিথমের বর্তমান আকার ও প্রতীকের জনক তিনি। তিনিই আবার এই দুটিকে একটি সমীকরণে বাঁধলেন—যাকে বলা হয় অয়লারের সমীকরণ,—($_{e}tx = \cos x \pm i \sin x$)। কমপ্লেক্স এনালিসিসের পথে তিনি কচি-রিমানের (Canchy-Ricmann) সমীকরণের দ্বারে এলেন। আর জানালেন অসংখ্য ডিফারেনশাল ইকুয়েশন। তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতি আর ভেরিয়েশনের ক্যালকুলাস গড়ে ওঠে। আধুনিক টোপোলজি বা সংস্থানিক দৈশিক তত্ত্বের ভিত্তিতে যে গণিত তা অয়লারের পলিহেড্রাল ফর্মুলা। তাঁর আবিষ্কারের দুশো বছর পর এর প্রয়োগের শুরু! অয়লার প্রচুর পেপার্স রেখে গেছেন—যার পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। বলা হয় তাঁর বই প্রকাশ করলে 75 ভল্যুমে শেষ হবে।

অন্যদিকে জেকবি হলেন এক ব্যাঙকারের সন্তান, জন্ম জার্মানির পোটসডামে দশই ডিসেম্বর 1804 সালে। বার্লিনের শিক্ষার পর 1826 সালে ইনি কোনিংসবার্গ বিশ্ববিদ্যলেয়ে অধ্যাপনা করতে এলেন। 1827 থেকে 1843 সাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রফেসার হয়ে কাজ করেন। এই সময়ে জেকবি নিয়েল আবেলের সহযোগিতায় এলিপটিক ফাংশনটি আবিষ্কার করেন 1821 সালে। এই ফাংশনটিকে এরপর তিনি একা আরো সূক্ষ্ম করে সাধরণী রূপ দেন। তাছাড়া মেকানিক্স, ভেরিয়েশনেল ক্যালকুলাস, পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এ গবেষণা করলেন। এই শেষের কাজটি ফরাসি স্কুল, যা ল্যাগরাঞ্জ ও পোয়াসোঁর কাজ, তা ভিত্তি করে গড়ে উঠলো এবং এই কাজে ধরা পড়ে হ্যামিলটন। জেকবির এই কাজটি পদার্থবিদ্যা জগতের এক হাতিয়ার। হ্যামিলটনের মেকানিক্স জেকবির হাতে হলো হেমিলটন-জেকবি ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ, যা সনাতন পদার্থবিদ্যার গতিবাদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ডিটারমিনেন্টসের যে প্রতীক তার ভ্রূণরূপ জেকবির চিন্তায় ধরা পড়ে। অত্যাধিক পরিশ্রমে জেকবির স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ছুটি নিয়ে ইটালি ঘুরে এসে 1843 সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। এই পদে থাকতে থাকতে 18ই ফেব্রুয়ারি 1859 সালে তিনি মারা যান। পেছনে রেখে যান Gesammelte Werke নামে তাঁর কাজের বিরাট সংকলনটি। (প্রসঙ্গত জেকবি বা Jacobi নামের সঠিক জার্মান উচ্চারণ হওয়া উচিত 'ইয়াকোবে'।)

অয়লার ও জেকবি দুজনেই প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁরা ছিলেন গণিত সমাজে, গাণিতিকদের সাহচর্যে। দুজনেই জ্যামিতিকে এলজেব্রায় রূপান্তর করেছেন, এনালেটিক গণিতের উন্নতি ঘটিয়েছেন, নতুন গণিতের ধারার খোঁজ জানিয়েছেন এবং জানিয়েছেন অজস্র ফর্মুলা—যার সাহায্যে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান সহজেই করা যায়। বৃটিশ গণিতজ্ঞরা রামানুজনকে এঁদের সঙ্গে একাসনে বসালেন। অথচ রামানুজনের প্রথাগত শিক্ষা নেই, তিনি তাঁর কাজের প্রমাণ দিতে পরাঙ্মুখ। তবু এত গরমিলে আছে একটি মিল। অয়লার-জেকবি-রামানুজন তিনজন গণিতের সমস্যার এলজেব্রার প্রতীক রূপ মনের আয়নায় দেখতে পারতেন, পারতেন ফর্মুলার আকারে এঁকে দিতে। অয়লার-জেকবি যেখানে ফর্মুলাটি মনের আয়নায় ধরবার পর প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি মেনে যুক্তির পথে প্রমাণ দিতে নামতেন, রামানুজন প্রমাণের পথে হাঁটেন নি। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মতো তাঁর কাছে সত্য শুধু সমস্যা আর তার সমাধান। পথের বর্ণনা দিতে তাঁর আলস্য। তিনি খাঁটি আর্যভট্ট-দ্বিতীয় ভাস্করের ঘরানার মানুষ। কেরল স্কুলের সুর তার গণিতের অর্কেস্ট্রায় শোনা যায়। তিনি ইনট্যুশনকে মেনে গণিতকে চিনেছেন। গণিত তাঁর বোধির ফসল নয়, এটি তাঁর বোধিমননের উপহার।

হার্ডি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় গণিতজ্ঞ বলে জানালেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে কেম্ব্রিজ থেকে হার্ডি একটি রিপোর্ট পাঠালেন ঃ—বিষয় রামানুজন।

"আমার এই রিপোর্টে ইংলণ্ডে আসার পর রামানুজন যে সব কাজ করেছেন সেগুলি নিয়ে শুধু আলোচনা করব। ইংলণ্ডে ইনি আসেন 1914 সালের এপ্রিলে, তারপর কিছু কাজ প্রকাশিত হয়েছে, কিছু বা আছে প্রকাশের অপেক্ষায়। আমার বলতে বাধা নেই, ইংলণ্ডে যখন তিনি আসেন তখন সঙ্গে ছিল এক বিরাট অপ্রকাশিত বিষয় সম্ভার, সেখানে আছে শতাধিক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ফর্মুলা যার অনেকগুলিই প্রমাণিত, অনেকগুলি আবার অনুমানমূলক। এদের সম্পাদনার কাজ চলেছে, কাজেই এর অনেকগুলি, আশ্চর্য সুন্দর সমাধানগুলি, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হবে।"

হার্ডির রিপোর্ট পাঠানো হয় 1917 সালে। এই সময়ে রামানুজন বারোটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। সঠিক বলতে এগুলি তাঁর

তিন বছরের ফসল, 1914 থেকে 1916 সালের মধ্যে বৃটিশ জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ। হার্ডি এগুলি নিয়ে রিপোর্টে আলোচনা করলেন। তবু তিনি একটি পেপার নিয়ে বেশি আলোচনা করলেন সেটি হলো কম্পোজিট সংখ্যারাশি নিয়ে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধ 'হাইলি কম্পোজিট নাম্বার্স (Highly Composite numbers)। হাইলি কম্পোজিট সংখ্যা তাকেই বলা হয় যার ডিভিসর বা ভাজকের সংখ্যা যে কোনো ক্ষুদ্র সংখ্যার চেয়ে বেশি। 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 120, 180 হলো এ ধরণের প্রথম সংখ্যা গুচ্ছ। এই প্রবল যৌগিক সংখ্যাদের আকার প্রকার সম্পর্কে বিস্ময়কর সব শুদ্ধ তথ্য কী ভাবে যে পাওয়া যেতে পারে সেই সাদাসিধে রীতিটি রামানুজন জানালেন। সেইখানে দেখালেন সবচেয়ে বড় এ জাতীয় যৌগিক সংখ্যাটি হলো।

$$6746328388800 = 2^6, 3^4, 5^2, 7^2, 11, 13, 17, 19, 23.$$

হার্ডি জানালেন ঐ পেপারটি প্রকাশের পর রামানুজন এই ধরনের আরো একটি সংখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। রামানুজন যে সমস্যাটি এখানে বেছে নিয়েছেন সেটি যে অভূতপূর্ব কিছু তা শুধু নয় এটি বর্তমানের গণিত গবেষণার পথভোলা বিষয়। তবু এই সমস্যার সমাধানে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আর উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে প্রশংসা করতেই হবে। প্রফেসার হার্ডি তার পরে লিখলেন, "রামানুজনের কাজ সম্পর্কে আমি যা জানালাম এটি সংক্ষিপ্ত আর অসম্পূর্ণ নিশ্চয়। তবে তাঁর স্বকীয়তা, আশ্চর্য শক্তি সম্পর্কে মনে হয় মোটামুটি জানাতে পেরেছি। এই সময়ে ভারতবর্ষ অনেক প্রতিভাবান গণিতবিদদের উপহার দিয়েছে, তাঁদের অনেকে কেম্ব্রিজে এসে শিক্ষায়তনের সম্মান পেয়েছেন। রামানুজনের কাজ যে অন্য ধরণের একথা তাঁরাই প্রথম ধরতে পারবেন। ভারতবর্ষে রামানুজন হলেন একজন প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ গণিতের ধারক, যাঁর কাজ ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে প্রোজ্বল আশা জাগিয়ে রাখবে বলে মনে করি।"

এই ভারতীয় গণিতবিদকে কেম্ব্রিজ সম্মান সূচক বিএ উপাধি দেয়। রামানুজন হলেন এস রামানুজন বি. এ. (কেন্টাব)।—সম্মান-রামানুজনের পরিবর্তন আনে না। তিনি গণিত নিয়েই মগ্ন এবং মত্ত। হার্ডি বললেন, গণিতবিদ হিসাবে তিনি তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিদিন আধডজন নতুন নতুন কাজ নিয়ে হার্ডির কাছে ছুটে আসতেন তিনি।

এই পরিশ্রমে, অর্ধাশনে, অনশনে, তাঁর শরীর ভেঙে গেল। দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে তিনি ছিলেন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে। আর ইংলণ্ডে পেলেন ঠাণ্ডা আর শীত। 1917 সাল থেকে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। অবশেষে ওয়েলস, ম্যাটলক বা লণ্ডনের স্যানাটোরিয়ামে ইংলণ্ডের শেষ কালটুকু প্রায় কাটিয়ে গেলেন। এই সময়ে 1918 সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারী তারিখে রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করে। রামানুজন হলেন এস রামানুজন বি এ (কেন্টাব), এফ. আর. এস।

রামানুজন প্রথম ভারতীয় এফ আর এস নন। সার আরদেসীর কার্সেটজী (Sir Ardeseer Cursetjee), একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, প্রথম এফ আর এস হন 1841 সালে।—তবে রামানুজনের ফেলো হওয়া ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের এক নতুন বাতাবরণের সৃষ্টি করে। —এর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছে। তারই পিঠাপিঠি রামানুজনের এই সম্মান ভারতবর্ষে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

রামানুজন তখন ম্যাটলকের ম্যাটলক হাউস নামে স্যানাটোরিয়ামে বন্দী। সেখানে হার্ডির পাঠানো টেলিগ্রাম পেলেন। টেলিগ্রামের খবরটি পড়তে বা বুঝতে তাঁর দেরি হলো! পরে হার্ডিকে চিঠিতে সেই অবস্থার কথা জানিয়ে লিখলেন,........

ম্যাটলোক হাউস
ম্যাটলোক

প্রিয় মিঃ হার্ডি,

কথাদিয়ে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাতে পারি না। স্বপ্নেও আমি নির্বচিত হবার সম্ভাবনার কথা ভাবিনি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে তিনবার আমি পড়লাম ফেলো ফিলোজফিকেল সোসাইটি—না, ফেলো রয়েল সোসাইটি নয়। এইতো সেদিন কেম্ব্রিজের ফিলোজফিকেল সোসাইটিতে সভ্য হিসাবে আমার নির্বাচিত হবার কথা শুনেছি। তাই আপনি সে খবর জানিয়ে পিকাডেলি থেকে আমাকে টেলিগ্রাম পাঠালেন দেখে ধাঁধায় পড়ে গিয়ে ছিলাম। বেশ কিছু পরে অবশ্য আপনার টেলিগ্রামটা ঠিকঠাক পড়তে পারি।

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ মেজর মেকমোহন ও মিঃ লিটলউডকে জানাবেন। তাঁদের ঠিকানা জানিনা কাজেই নিজে চিঠি লিখতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

একান্ত আপনার

এস. রামানুজন

অধ্যায় ঃ ছয়

●

মাথুর (1918-1920)

ট্রিনিটি কলেজের মানুষজনরা আদর করে রামানুজনকে ডাকতেন প্রিয় জ্যাম (Dear Jam) বলে ! এই জ্যাম নামের মানুষটি ইংলণ্ডে চার বছর কাটাতে না কাটাতে রীতিমত হইচই তুলে সম্ভ্রম আদায় করে নিলেন। 1914 সালের এপ্রিলের শেষে যিনি ইংলন্ডের মাটিতে পা রাখলেন 1918 সালের ফেব্রুয়ারির শেষদিনে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো হলেন। রামানুজন সবে ত্রিশ পার হয়েছেন মাত্র। হার্ডি এফ. আর. এস. হয়েছিলেন বত্রিশ বছর বয়সে। হার্ডি গণিত-জগতের ছাত্র ও অধ্যাপক। ইংলণ্ড তাঁর স্বদেশ। রামানুজন অন্য দিকে এফ এ ফেল করা ছাত্র এবং ইংলন্ড তাঁর বিদেশ। সব মিলিয়ে এফ আর এস হয়ে রামানুজন তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে তুললেন। 1918 সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। যে সব গণিতবিদ যুদ্ধের কাজে কলেজ —বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছেন। রামানুজনের প্রকাশিত গবেষণা পত্র পড়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন, অনুপযুক্তের হাতে সম্মান অর্পন করা হয়নি। রয়েল সোসা-ইটিশ ফেলো হয়ে রামানুজন সম্মানিত না সোসাইটি সম্মানিত—সে প্রশ্ন বরং তোলা যেতে পারে। রামানুজন ফেলো হওয়ায় রামানুজন যত না খুশি তার চেয়ে খুশি হার্ডি। তিনি হিরেকে চিনেছিলেন ঠিকই।

সেই হিরে তখন ম্যাটলোক হাউসে, স্যানাটেরিয়ামে আছেন। 1917 সালের গ্রীষ্মে তাঁর শরীর বেশ খারাপ হলে কেম্ব্রিজের একটি নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। তারপর ভর্তি হলেন ওয়েলসে এক স্যানাটোরিয়ামে, পরে ম্যাটলোকে। বিশ্রামে, ওষুধে শরীর সারে। কিন্তু আবার ঘরে ফিরে এলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা সেদিন মনে করলেন তাঁর অসুখ হলো ফুসফুসে যক্ষা—(Pulmonary Tuberculosis)। বর্তমান চিকিৎসকরা মনে করেন, যক্ষা নয়। ভিটামিনের অভাবে তাঁর শরীরের সর্বত্র অবক্ষয় ঘটেছিল। অর্ধাশনে

অনশনে থাকার কুফলটি শরীরে টেনে নিয়েছিলেন তিনি। যা বা খেতেন, সে খাবারে উপযুক্ত ক্যালরি ছিলনা, ভিটামিন ছিলনা। বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গে যুজতে হলে যে ধরণের নিরামিষ খাবারের প্রয়োজন, গত তিন চার বছরে তা কখনই তিনি গ্রহণ করেন নি। শরীর অবসন্ন, অথচ মস্তিষ্ক তখনও আশ্চর্যভাবে সচল। হার্ডিরা ভাবেন, মাদ্রাজে ফিরে গেলে গরম আবহাওয়ায় আর বাড়ির সেবা যত্নে, নিজের মনোমত আহার পেলে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। অথচ রামানুজন যেতে রাজি নন। 31শে মার্চ, 1919 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া পাঁচবছরের রিসার্চ স্কলারশিপ শেষ হবে। তিনি 1918 সালে ফিরে যেতে চান না।

অন্য কারণও ছিল। তা হলো ইংলন্ড থেকে মাদ্রাজে ফেরার ভাড়া। রামানুজনের পকেট শূন্য। অথচ হার্ডির ধারণা নিজের দেশে গরম আবহাওয়ায়, আপন পরিবেশে, পরিচিত আহারে রামানুজন সম্পুর্ণ সুস্থ হতে পারেন। যক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত আহার, পরিবেশ ও বিশ্রাম। কেম্ব্রিজে তিনি এই তিনটিকে পাবেন না। একমাত্র মাদ্রাজে তিনটিকেই পেতে পারেন।

ইতিমধ্যে লিটলউড ফিরে এসেছেন। হার্ডি তখন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। লিটলউড ফিরে এলেন তাঁর নিজের কলেজ ট্রিনিটিতে, কেম্ব্রিজে। এই দুই বন্ধু একযোগে রামানুজনকে কেম্ব্রিজের ফেলো করতে উঠে পড়ে লাগলেন। লিটলউড তাঁর লেখা 'এ ম্যাথেমেটি-শিয়ান'স মিসলেনি' (A Mathematician's Miscellaney) নামে বইয়ে সেই প্রয়াসের কথা লিখে গেছেন। হার্ডি স্বয়ং কেম্ব্রিজের ফেলোশিপ বাছাইয়ের কমিটিতে ছিলেন না। সে বছর ছিলেন লিটলউড। তিনি লিখেছেন, সেদিন কী ঘটেছিল তার অনপুঙ্খ জানেন একা তিনি। 1914-18 সালের বিশ্বযুদ্ধের পর কেম্ব্রিজের ডামা-ডোল অবস্থার বর্ণনা তিনিই দিতে পারেন।—এই বিপর্যস্ত সময়ে রামানুজনের ফেলোশিপ নির্বাচনটি নিয়ে কমিটিতে আলোচনা ওঠে। অনেকে বাধা তোলেন। কারণ হিসেবে হাজির হয় বর্ণবিদ্বেষ, তাঁর এম. এ. ডিগ্রি না থাকা ইত্যাদি। অন্যদিকে তিনি যে এফ. আর. এস হয়েছেন সেই সম্মানের গুরুত্বটি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লিটলউড স্বরং এবং হার্ডির বন্ধুরা এই বিষয়টি নিয়ে বিচার করতে বললেন। কূট কৌশলে শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ পক্ষ পরাজিত হন। আর ট্রিনিটি

কলেজের ফেলো নির্বাচিত হলেন রামানুজন ; তারিখ 13ই অক্টোবর 1918 সাল। ফেলোশিপের ফলে কোন শর্ত বা কর্তব্য ছাড়াই বার্ষিক আড়াইশ পাউন্ড বৃত্তিলাভের অধিকারী হলেন তিনি। হার্ডি এবার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে সে খবর জানিয়ে চিঠিতে লিখলেন ;—

"একটি বিজ্ঞানীর সম্মান ও অধিকার নিয়ে ভারতে তিনি ফিরে যাবেন, যে সম্মান কোনো ভারতীয় আগে অর্জন করেননি। আমার বিশ্বাস, একটি মনোহর রত্ন হিসেবে ভারত তাঁকে সম্মানিত করবে,।"

এই মুখবন্ধ টুকুর পর বিশ্ববিদ্যালয়কে হার্ডি বললেন, নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয় আবার তাঁর কাজের পূর্ণ সুযোগের সুবন্দোবস্ত করবে ; দেখবে তাঁর গবেষণার কাজে যেন কোনো বাধা না দেখা দেয় ; সাময়িক নয়, একটি স্থায়ী বৃত্তির সুযোগ নিশ্চয় তিনি পাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রামানুজনের স্বীকৃতি স্বীকার করে। 1919 সালে আড়াইশ পাউন্ড বার্ষিক বৃত্তি শেষ হবার পর ঐ বৃত্তিটি আরো পাঁচ বছরের জন্য প্রদত্ত হলো। তাছাড়া যেমন 1914 সালে ইংলন্ড যাবার খরচ বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছিলেন, তারই জের টেনে বিশ্ব-বিদ্যালয় জানায়, দেশে ফিরে আসার খরচ দেবে বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া ঐ গবেষণাবৃত্তি পাবার পাঁচবছর কালে যদি ইউরোপে যাবার প্রয়োজন হয়, তবে রামানুজনের সেই যাতায়াতের খরচও দেবে বিশ্ববিদ্বালয়। ....হার্ডি নিশ্চিন্ত হলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষণা বৃত্তির কথা জেনে এগারই জানুয়ারি 1919 সালে দুই নম্বর কলিনেট রোড, পাটনি এস. ডব্লু. 15 (Colinette Road, Putney, SW15) থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জনিয়ে একটি চিঠি লেখেন তিনি। সেখানে বললেন, দেশে তিনি শিগ্গির ফিরে যাবেন। সেখানে ঐ বার্ষিক আড়াইশ পাউন্ড অর্থ তাঁর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। ঐ টাকা থেকে আগের মতো তাঁর বাবা-মাকে ষাটপাউন্ড দেওয়া হবে। আর তাঁর ব্যক্তিগত খরচ খরচার পর, ঐ বৃত্তি থেকে যা বাঁচবে, তা দিয়ে কোনো গরিব মেধাবী ছাত্রের স্কুল ফি, কোনো অনাথ ছাত্রের বই এর দাম যদি দেওয়া হয়। এ ধরণের বন্দোবস্ত ফিরে আসার পর করা যায় না ? ···তিনি বর্তমানে অসুস্থ, কাজেই শেষ দুবছর গণিতে গবেষণার কাজে ততটা নিযুক্ত হতে পারেন নি। হয়তো আবার

গবেষণায় তিনি অনেক বেশি সময় দিতে পারবেন, পারবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের প্রতিদান দিতে। সুস্থ হয়ে উঠবেন যে আবার—এটি তাঁর আশা।

বারবার অসুস্থ হচ্ছেন তিনি। শরীর ভেঙে পড়ছে। তবু মস্তিষ্ক আগের মতো সচল, সজীব। হার্ডি সেই গল্প একবার করলেন।… রামানুজন তখন হাসপাতালে। তাঁকে দেখতে এলেন হার্ডি। উৎকণ্ঠা ঢেকে মজা করে বললেন, একটা ট্যাক্সি করে তিনি এসেছেন, তার নম্বরটা সাদাসিধে, 1729—যা তিনটি প্রাইম সংখ্যা সাত, তেরো আর সতেরোর গুণফল। এইশুধু। শুনে বিছানায় শুয়ে থাকা রুগির চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। রামানুজন বললেন, নম্বরটা সাদাসিধে নয়। দুধরণের দুটি রাশির ঘনফলের যোগে পাওয়া সবচেয়ে যে ছোট সংখ্যা পাওয়া যায় 1729 হলো তা। এটি হলো 12^3+1^3 অথবা 10^3+9^3। চারবছর এই মানুষটিকে দেখে কথা শুনে হার্ডি বহুবার বিস্মিত হয়েছেন। আরো একবার হলেন। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে বললেন, এধরণের চারবর্গের সমস্যার সমাধানটা ভাবতে পারেন?—রামানুজন সামান্য ভেবে বললেন, এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তবে সংখ্যাটা বেশ বড়সড় হবে, মনে হয়।…… হার্ডি পরে সংখাটি খুঁজে পেলেন—নয় ডিজিটের একটি সংখ্যা ঃ—635318657 যা হলো 158^4+59^4 অথবা 133^4+134^4 এর সমান!—মুমূর্ষু রুগিটির বোধিমনন কত সজীব, কত সচল! সংখ্যারাশি যেন তাঁর বীজমন্ত্র, তাঁর ধর্ম, তাঁর সঙ্গী, তাঁর আত্মার আত্মীয়। হার্ডি বললেন, "যে কোনো পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা বা ইনটিজার (Integer) হলো রামানুজনের ব্যক্তিগত বন্ধু, তাঁর প্রাণের আরাম।....যে কোনো রাশি সংখ্যার মেজাজ অদ্ভুত দক্ষতায় তিনি বুঝতে পারতেন।" নিউম্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "সব আড়ম্বর, বর্ণনা সরিয়ে ফেলে ঠিক সত্যটা কত সহজে চিনতেন তিনি।"....গণিতের এই সত্যকে চিনতে সেদিনও তিনি সক্ষম। হাসপাতালের বিছানায় তিনি পড়ে আছেন ঠিকই, তবু সংখ্যারাশির চেহারা শুধু নয়, মেজাজ বৈশিষ্ট্য তখনো চিনতে পারেন। এখানে স্মৃতিভ্রম বা বুদ্ধিভ্রংশতা ঘটেনি।

দেশে ফিরে যেতে প্রস্তুত হতে থাকেন রামানুজন। ইংলণ্ডের প্রবাসে সাতাশটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন তিনি, তার সাতটি হলো হার্ডির সহযোগিতায়। যুদ্ধ ফেরৎ গণিতজ্ঞ লিটলউড সেগুলি পড়ে বিস্মিত হন। হার্ডির সঙ্গে সেইসব পেপার নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশেষ করে পার্টিশন (Partition) বিভাগে এদের যুগলবন্দীটি লিটলউডকে স্তম্ভিত করে ফেলে। কী করে ঐ ফর্মুলা তাঁরা পেলেন !

একটি রাশির পার্টিশন বোঝাতে জানানো হয় কত নির্দিষ্ট সংখ্যায় সেই রাশিটি ক্ষুদ্রতর সংখ্যার যোগফলে জানানো যাবে। যেমন 5 ; এই সংখ্যাকে পার্টিশনে জানানো যায়, 5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1+1+1+1+1—অর্থাৎ সাতভাবে। সুতরাং p(5) = 7 পার্টিশনে পাওয়া মানগুলো বেশ মজার। যেমন ঃ—

n o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p(n)	1	2	3	5	7	1	15	22	30	42

দেখা যায় শুরুতে n ও p (n) এক থাকলেও ক্রমশ p (n) বেড়ে চলে। সংখ্যা বড় হলে p (n) এর বৃদ্ধিও বিরাট। যেমন ঃ—

n	50	100	150	200
p(n)	204226	190569292	40853225313	3972999029388

সংখ্যাটি জানা থাকলে তার পার্টিশন সংখ্যাকে কোনো ফর্মুলার সাহায্যে মোটামুটি জানা যায় কি ?

একটি পদ্ধতি সেদিন জানা—যা এনালিটিক নম্বর থিওরি বিভাগের প্রাইম নম্বর থিওরেম। এখানে বলা হয় x এর চেয়ে ছোট যেসব প্রাইম সংখ্যা পাওয়া যাবে তাদের মোটামুটি x/Logx ফর্মুলার সাহায্যে জানানো যায়। ভুল ত্রুটি এক্ষেত্রে যৎসামান্য, তবে x এর মান বাড়লে, ভুলের সীমাও বেড়ে যায়। তবু বলা যায় এই যে এপ্রোক্সিমেসন বা আসন্ন রূপ পাওয়া যায়, এটি কাজের। আবার দেখা যায় x যদি ইনফিনিটি হয়, তবে আসন্ন মান ও সঠিক মানের অনুপাত হবে 'এক'। এ জাতীয় ফর্মুলাকে বলা হয় এসিমটোটিক ফর্মুলা।

1918 সালে হার্ডি রামানুজন পার্টিশনের সংখ্যা বের করার একটি এসিমটোটিক ফর্মুলার খোঁজে নামলেন। একটি ফর্মুলা তাঁদের হাত থেকে পাওয়া গেল—

$$p(n) = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \sqrt{q} \sum_{q=1}^{৯} \sqrt{q}\ A_q(n)\ \Psi_q(n) \ldots (1)$$

যেখানে $Aq(n) = \underset{p.q.=1}{\Sigma} \quad Wp.q. e^{-2np\pi i/q}$

৭ = a $\sqrt{n}$ এর নিকটবর্তী কোনো ইনটিজার,
a = একটি পজিটিভ ধ্রুবক (কনস্ট্যান্ট)

$$\Psi_q(n) = \frac{d}{dn}\left(\frac{e^{\pi(\sqrt{\frac{2}{3}}).\lambda^n/q}}{\lambda^n}\right) + O\left(n^{-\frac{1}{4}}\right)$$

এখানে $\lambda^n = (n - \frac{1}{24})^{\frac{1}{2}}$
Wpq জানবে একটি ইউনিটির 24q তম মূল
(pq) হলো p ও q'র গসাগু
এবং 'o' হলো 'a'র উপর নির্ভরশীল।

একটি জটিল ফর্মুলা। অথচ সুন্দর ও কাজের। প্রফেসার মর্ডেল এই ফর্মুলাটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, এটির প্রমাণ জানাতে কমপ্লেক্স ভেরিএবলের ফাংশনের জন্য কচি'র ইনটিগ্রালের ব্যবহার প্রয়োজন ; রামানুজন এটি জানতেন না। অবশ্য এ জাতীয় ফর্মুলার ধারণা আকৃতি ইত্যাদি রামানুজনের মাথায় আগে খেলেছে। রামানজনের হাত না থাকলে এ জাতীয় ফর্মুলা জানার সুযোগ ঘটতো না।

লিটলউড এই ফর্মুলা নিয়ে গভীরে আলোচনা করলেন। সহযোগিতার যে রীতি আছে, তিনি তা এড়ালেন। দুজনের যুগলবন্দীর কোনখানে কে কি কাজ করেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। অবশ্য হার্ডির অনুমতি সেখানে ছিল। তিনি বললেন ফর্মুলা (1) এর প্রথম টার্ম যে অনুমতি নিয়ে গড়ে উঠেছে, তা রামানুজনের নিজস্ব ; অর্থাৎ রাগের কাঠামোটি রামানুজনের। এটি যে আসন্ন ফল জানাতে সক্ষম তা যে কোনো কুশলী বলতে পারেন। কাঠামোর ভেতরে যে সব টার্ম আছে তাদের নিজস্ব আকৃতিটি যে কী সেটি হলো হার্ডি-রামানুজনের নিজস্ব কাজ। λn এর মান যে $(n-\frac{1}{24})^{1/2}$ হবে এটি রামানুজনের আরো একটি অনুমিতি। এবং $\Psi_q(n)$ এর d/dn এর চিন্তা—এটিও রামানুজনের। এইসব অনুমিতি নিয়ে প্রারম্ভিক

ফর্মুলার সাহায্যে নানা রাশির p(n) বের করে ভুল ত্রুটিটি জেনে নিতে বসলেন দুজনে। এইসব পরীক্ষার নিরীক্ষার কালে রামানুজন একটি জেদ নিয়ে বললেন, যা জানা যাচ্ছে, তার থেকেও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। 'একটি ফর্মুলা থাকবে যেখানে ত্রুটি হবে o (1)'। হার্ডি তাঁর প্রথাসিদ্ধ জ্ঞান আর রামানুজন ইনটিউশন নিয়ে ফর্মুলাটির সম্পূর্ণতা দিতে উদ্যোগী হলেন। তাঁদের জানানো ফর্মুলার সাহায্যে 200 এর p(n) পাওয়া যায় 3972998999318. 896 যেখানে সঠিক মান হলো 3972999029388 অর্থাৎ প্রথম ছয়টি সংখ্যা ঠিক। এঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন শেষ সাতটি সংখ্যায় আরো একটি সংখ্যার যোগে দাঁড়াবে 397299029388·004 ! অতএব একটি ফর্মুলার সাহায্যে, আসন্ন নয়, সঠিক রাশিটি পাওয়া সম্ভব। $o(n^{-1/4})$ টার্মটি পাওয়া সম্ভব হলো ! একটি আসন্ন ফর্মুলা থেকে সঠিক ফর্মুলার পথে পেঁৗছুনো যে সম্ভব সেটি এই দুজন গণিতজ্ঞ খুঁজে পেলেন ! হার্ডি রামানুজনের ফর্মুলা হলো।

$$p(n)=\frac{1}{2\pi\sqrt{2}}\sum_{q=1}^{p}\sqrt{q}\left(\sum_{p,q=1} W_{p,q}\, E^{2\pi p\pi i/q}\right)\frac{d}{dn}\frac{\left(E^{\pi(\sqrt{\frac{2}{3}})\lambda n/q}\right)}{\lambda n}+O\left(n^{-\frac{1}{4}}\right)$$

প্রসঙ্গত 1397 সালে রাদেমাচের (H. Rademacher) p(n) এর জন্য একটি কনভারজেণ্ট সিরিজ পেলেন যার গঠনে আছে রামানুজন হার্ডির এসিমটোটিক ফর্মুলা। সেটি হলো ঃ—

$$p(n)=\frac{1}{\pi\sqrt{2}}\sum_{q=1}^{\infty}\sqrt{q}\left(\sum_{q=1} W_{pq}\, E^{-2np\pi i/q}\right)\frac{d}{dn}\left(\frac{\operatorname{Sinh}\pi(\sqrt{2/3}.\lambda n/q)}{\lambda n}\right)$$

রামানুজনের জানানো λn ও d/dn এখানেও থাকে। তেমনি থাকে হার্ডির জানানো Aq(n)। হার্ডির টার্মটি প্রমাণ করা যায়। অন্যদিকে রামানুজনের টার্মকে এখনো বলা হয় অনুমিতি (Conjeneture), লিটলউড তাঁর আলোচনার শেষে লিখলেন "দুটি

ভিন্ন মনীষা, দুটি মানুষের মিলিত মনোহারী সহযোগিতায় একটি চমৎকার থিওরেম গড়ে ওঠে। সৃষ্টি কার্যে দুজনই তাঁদের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্বের ধারা ঢেলে দিলেন, মেশালেন অকৃত্রিম প্রয়াস।" লিটলউড আর রামানুজন দুজনেই হার্ডির কর্মে-সহযোগী। মর্মের সঙ্গী। পার্টিশনের ফর্মুলার অন্দরে যে পদ্ধতি কাজ করে সেই পদ্ধতিটিও তিন জনের সৃষ্টি-'হার্ডি-লিটলউড-রামানুজন সার্কল মেথড।' একটি পদ্ধতি ভেঙে পাওয়া যায় দুজনের হাতে গড়া হার্ডি-রামানুজন ফর্মুলা। চিন্তাধারায় বিপরীত, অথচ কত অনায়াসে সাবলীলভঙ্গীতে দুজনে একটি নতুন সুর সৃষ্টি করতে পারেন!—হার্ডি জানেন, তিনি রত্ন চিনেছিলেন। সেই রত্নের আলোয় নিজেকেও চিনলেন তিনি।

এই যুগের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, "আমার কর্মজীবনের ধারায় এক বাঁক দেখা দিল দশ বারো বছর পর। 1911 সালে লিটলউডের সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ সহযোগিতার আরম্ভ আর 1913 সালে আমি রামানুজনকে আবিষ্কার করি। তারপর এই দুজনের সঙ্গে আমার শ্রেষ্ঠ কাজের গ্রন্থীবন্ধন ঘটে গেছে। এককথায় এই দুজনের সঙ্গে আমার এই অনুষঙ্গ আমার জীবনের চূড়ান্ত ঘটনা। মন যখন খারাপ হয়, যখন অন্যের ক্লান্তিকর বাগাড়ম্বরতা শুনতে হয়, তখন নিজেকে ডেকে আমি বলি, 'একটা কাজ আমি জীবনে করেছি তা তোমরা কোনোদিন করতে পারনি, হে। লিটলউড আর রামানুজনের সঙ্গে সমতটে দাঁড়িয়ে একযোগে কাজ করেছি।' হয়তো তাই আমার পূর্ণতা বা মেচ্যুরিটি দেরিতে এসেছে। চল্লিশ বছর পার করে, অক্সফোর্ডে প্রফেসার থাকার কালে আমার শ্রেষ্ঠ কাজগুলো করলাম। আর তারপর, প্রবীন মানুষ বৃদ্ধ গণিতজ্ঞের রীতি অনুযায়ী ভাঁটার পথে গতি অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে। বলতে পার, ষাটবছর হলেও একজন গণিতজ্ঞ সেই রকম দক্ষ কুশলী থাকেন। থাকেন, তবে তার কাছ থেকে নতুন কিছু পাবার আশা করা বৃথা।"

চল্লিশের কাছাকাছি সময়ে হার্ডি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলি করতে পারলেন। তারপর ধীরে ধীরে ধরা দেয় অবক্ষয়। আর এই সময়ে রামানুজনের বয়স ত্রিশ। তখন তাঁর শরীর ভেঙে চলেছে। শরীরের এই অবক্ষয় যা তাঁকে মৃত্যুর কোলের দিকে নিয়ে চলেছে, সেখানে শরীরের ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ ঘটে চললেও বোধিমননে মৃত্যুর স্পর্শ

নেই। আছে ক্লান্তির ছোঁওয়া। এটা কী এক ট্রাজেডি ? হার্ডি লিখলেন, "রামানুজনের অকাল মৃত্যুতে ট্রাজেডির ছোঁওয়া নেই। যদিও অল্প বয়সে কোনো প্রতিভার মৃত্যু নিশ্চয় বেদনার, দুঃখের। তবু একটি গণিতজ্ঞ সাধারণত ত্রিশেই বৃদ্ধ ; আর তারপর তাঁর মৃত্যু সে এক নির্ধারিত ঘটনা মাত্র। আবেল (Abel) ছাব্বিশ বছরে মারা গেলেন ; অবশ্য তারপরেও গণিতে তিনি অনেক কিছু হয়তো দিতে পারতেন; তবু আরো মহত্তর তিনি হতে পারতেন না। রামানুজনের অকাল মৃত্যু তাঁর জীবনের ট্রাজেডি নয়। তাঁর জীবনের পাঁচটি রুক্ষ বছর, যে সময়ে তাঁর প্রতিভা ভুল পথে গেল, পথ ভ্রষ্ট হলো, ক্ষতবিক্ষত হলো— সেই পাঁচ বছরের দুর্ভাগ্যই তাঁর ট্রাজেডি।"

হার্ডিরা ভাবেন, 1914 সালের আগের পাঁচটি বছর রামানুজন যদি ফিরে পেয়ে ইংলণ্ডে আসতেন ! তাঁর অসুস্থতার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ পাঁচটি নিষ্ফলা বছরের শুষ্কতা বার বার তাঁদের বিচলিত করে তোলে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন ইংলণ্ডের ঠাণ্ডা দুঃসহ আবহাওয়ায় না এলে এত তাড়াতাড়ি তিনি ফুরিয়ে যেতেন না ! ইংলণ্ড তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাঁকে তিলে তিলে হত্যাও তো করেছে ! পাঁচটি নিষ্ফলা বছরকে ঢেকে দেয় পাঁচটি সোনার ফসল ফলানো বছর। আবার এই পাঁচ বছরে ঘুণপোক কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে অজস্র ফলবান গাছটি। ফল ফলানো ফুল ফোটানো গাছটির দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও যেন নেই !—শুধু আশা, দেশে ফিরে রামানুজন যদি সুস্থ হয়ে ওঠেন !

সাতাশে ফেব্রুয়ারি 1919 সালে এস এস নাগোয়া (S. S. Nagaya) জাহাজে চেপে চার সপ্তাহ সমুদ্রে ভেসে বোম্বাইয়ে এলেন তিনি। তাঁর মা আর এক ভাই তাঁকে জাহাজ ঘাটে নিতে এলেন। স্ত্রী জানকী ছিলেন না। সেদিন তিনি করাচিতে তাঁর ভাইয়ের কাছে ছিলেন। রামানুজন স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলেন ; যাঁকে তিনি বিদেশীদের কাছে বলতেন, 'আমার বাড়ি'-'My House', যাঁর চিঠি না পেলে তিনি বিচলিত হতেন, কাজে মন দিতে পারতেন না—তিনি জাহাজ ঘাটায় নেই ;—কারণ রামানুজন ঠিক কবে যে আসছেন সে খবর শ্বশুর বাড়ি থেকে তাঁকে জানানো হয়নি। রামানুজনের বিদেশ যাত্রার দিনে জানকী ছিলেন না জাহাজ ঘাটে, কারণ রামানুজন চান নি। তের চৌদ্দ বছরের মেয়েটি রামানুজনের কথায় চোখ মুছে

কুম্ভকোনম ফিরে গেলেন! পাঁচ বছর পর স্বামী ফিরে এলেন। এবারেও আঠারো উনিশ বছরের মেয়েটি জাহাজ ঘাটে রইলেন না। রইলেন বিচলিত রামানুজন। দুদিন পর জানকী বোম্বাই শহরে রামানুজনের কাছে এলেন। তিনদিন বোম্বাই থেকে দোসরা এপ্রিল মাদ্রাজ শহরে পেঁছুলেন রামানুজনরা। একজন সামান্য ফেল করা দরিদ্র যুবক গিয়েছিলেন; ফিরে এলেন একজন প্রসিদ্ধ বিখ্যাত স্বনামখ্যাত গণিতজ্ঞ।

পয়লা এপ্রিল তারিখে, মাদ্রাজে পা রাখার আগে, ভারতীয় গণিত সমাজ একটি সভা ডেকে প্রস্তাব নেয়,—

"শ্রী এস রামানুজন বিএ, এফ আর এস। প্রখ্যাত এই গণিতবিদ কেম্ব্রিজে কিছু কাল কাটিয়ে কিছুটা ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে মাদ্রাজে ফিরে এসেছেন। তাঁর গণিত প্রতিভার দ্যুতিতে, মৌলিক গবেষণার ছটায় তিনি জগৎ সভায় ভারতবর্ষকে আলোকিত করে তুলেছেন। আমরা তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানাই। প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর পূর্ণশক্তি ফিরে পেয়ে আবার বিজ্ঞানের সুমহান কাজে ব্রতী হতে পারবেন।"

চারমাস পর, পয়লা আগস্ট তারিখে ভারতীয় গণিত সমাজ তাঁকে সম্মানিক সভ্য হিসেবে নির্বাচিত করলেন।....চারদিক থেকে সম্মান জোটে, তবু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। ওজন কমে যেতে থাকে, ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েন। তবু গণিতকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। ক্লান্তি নামে, শ্রান্তি আসে। সে শুধু দেহে। মনে মনে ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন হয়ে গণিত চর্চা করেন। ভাবেন; কখনো লিখে রাখেন। কখনো তা মনেই থেকে যায়, হারিয়ে যায়। তিন মাস মাদ্রাজে থেকে জন্মভূমি এড়োরের কাছে কাবেরি নদীর ধারে কোদুমুড়ি নামের এক গ্রামে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে আট সপ্তাহ থাকলেন। সঙ্গে মা কমলা এবং স্ত্রী জানকী। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে না। বরং কোদুমুড়ির আর্দ্র আবহাওয়ায় জ্বর জ্বালা বেড়ে যায়। বন্ধুরা বলেন, বরং তাঞ্জাবুরে তিনি থাকুন। শুকনো জায়গা। রোদ হাওয়া আছে। শরীর নিশ্চয় ভাল হবে। শুনে রামানুজন হাসেন। তান্‌জাবুরের শব্দ ভেঙে বলেন, ও হলো তান সাবু উর—আমার মৃত্যু স্থান। যা হোক দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখে কুম্ভকোনম এলেন, থাকলেন চারমাস। শরীর তেমন সারে না। 1920 সালের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজে এলেন। চেটপেট অঞ্চলে রায় বাহাদুর টি নুমবারুমল

চেট্টির বাড়ির এক অংশে বিনা ভাড়ায় থাকতেন। তাঁর চিকিৎসা আর অন্যান্য খরচ বন্ধুরা জোগাতেন। বন্ধু এস শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁদের একজন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আবার আসে, সাহায্যের কোনো দরকার কী আছে? রামানুজন হেসে জানকী কে বলেন, চেটপেটে সব চেটপেট (শেষ) হয়ে যাবে। জানকী চোখ মোছেন। সেবা করেন। এবার ফিরে এসে রামানুজন জানকীকে তিনটি জিনিস দিয়েছেন। দুটি জলের কলস। মাদ্রাজে বড় জলের কষ্ট। সেই জল ধরে রাখার জন্য দুটি কলস স্ত্রীকে দিলেন। আর দিলেন কেম্ব্রিজের এক চিত্রীর আঁকা তাঁর এক ছবি। এই তিনটি হলো জানকীর একান্ত নিজস্ব জিনিস। আর পেলেন শেষ সময়ের সেবা করার অধিকার এবং সাহচার্য। শুধু এটুকু। তবু এটুকুই জানকীর কাছে বিশাল সমুদ্রের মত অনেক। রামানুজনের গড়া ফর্মুলার মতো ছোট ; অথচ কত বিস্তার তার !

মাদ্রাজে ফিরে এসে জানুয়ারির বারো তারিখে হার্ডিকে চিঠি লিখলেন। এর আগে কোনো চিঠি যে দিতে পারেননি সেই দুঃখ জানিয়ে চিঠির শুরু। চিঠিতে জানালেন তিনি প্রফেসার রজার্সের ফল্‌স্ থিটা ফাংশনের থেকে ভিন্ন একটি ফাংশন বের করেছেন, নাম দিয়েছেন মক থিটা ফাংশন (Mock Theta Function)। আর সঙ্গে কিছু উদাহরণ।....

1917 সাল। তখনো তিনি সুস্থ। কেম্ব্রিজ লাইব্রেরিতে বসে বসে রামানুজন লণ্ডন গণিত সমাজের পুরনো লেখা-পত্র ইত্যাদি পড়ে চলেছেন। হঠাৎ 1894 সালে রজার্সের (Prof. L. J. Rogers) একটি গবেষণা পত্র পড়ে ছুটে হার্ডির কাছে গিয়ে রজার্সের ঐ কাজটি সম্পর্কে আলোচনায় মাতলেন। তিনি 1912 সালে ঐ একই সমাধানে স্বাধীনভাবে এসেছিলেন। অথচ তাঁর আঠারো বছর আগে রজার্স তা ভেবেছিলেন। আশ্চর্য ! ঐ কাজটির নাম হার্ডি জানালেন রজার্স-রামানুজন আইডেনটিটি বলে। কারণ "তাঁর কাজটি রজার্স আগে ভাবলেও তিনি রজার্সকে ছাপিয়ে গেছেন।"—সেই রজার্সের নাম আবার উল্লেখ করলেন হার্ডিকে, 1920 সালে। রজার্সের অংশত জানা৷ ফল্‌স্ থিটা ফাংশন থেকে আলাদা তাঁর মক থিটা ফাংশন। মিথ্যা নয়, নকল। ফল্‌স্ (False) নয়, মক (Mock)! তবু তাঁর চিন্তায় ভান নেই ; তা নকল নয়। স্বাভাবিক বাস্তব।—তেমনি

বাস্তব তাঁর অসুস্থতা। তাঁর চিন্তার মতো এখানেও কোনো ছেদ নেই। গণিতের সত্য খোঁজার স্বপ্ন চোখে নিয়েছিলেন শৈশবে। সেই অবিচ্ছেদ্য সম্মানের অফুরন্ত উৎসাহ অসমর্থ বিকল শরীরের কাছে বাধা পেতে থাকে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর ছায়া নামে। 1920 সালের ছাব্বিশে এপ্রিল তারিখে বত্রিশ বছর চার মাস চার দিন বয়সে সত্যানুসন্ধানী মানুষটি মারা গেলেন।

এক এপ্রিলে চৈত্রের মাঝে মাদ্রাজে এলেন যিনি, এক বছর পর আরেক এপ্রিলের শেষে, বৈশাখের মাসে, তিনি চলে গেলেন। হার্ডি, নেভিল, লিটলউড, কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের গণিতজ্ঞরা খবর পেলেন। তাঁদের আশংকা সত্যি হলো। মানুষটি গেলেন। পেছনে ফেলে রেখে গেলেন তাঁর কাজ, তাঁর নোট বই। দেশের মানুষ রামানুজনকে দুর্জ্ঞেয় সাধক বলে মেনে নিয়ে রইলেন। বিদেশের গণিতজ্ঞরা তাঁর কাজে বুঝতে গিয়ে সেদিন বারবার বিফল হলেন। বেল (E. T. Bell) তাঁর 'মেন অফ ম্যাথামেটিক্স' (Men of Mathematics) বইটিতে লিখলেন, "দক্ষ এনালিস্টরাও ভাবেন রামানুজন হলেন দৈবী উপহার। আপাত সম্পর্ক-সম্বন্ধহীন ফর্মুলায় তাঁর যে অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি তা আমাদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের অজানা অচেনা পথের হদিশ চেনায়। এনালিস্টদের এরপর নতুন এক কাজ জোটে,-সেই পথটি তৈরি করা।"—রামানুজন হলেন গণিতজ্ঞদের গণিতজ্ঞ।

তাঁর মৃতুর পর দেশ ও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় শোক সংবাদ প্রকাশ হলো। সেখানে হার্ডি-লিটলউড অথবা নেভিলের লেখা নেই। এরা লিখলেন অনেক পরে। 1921-28 সালে হার্ডি বারোটি বক্তৃতা দিলেন রামানুজনকে নিয়ে। 1936 সালে লণ্ডন ম্যাথামেটিকেল সোসাইটির মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো রামানুজন। পরের বছর হার্ডি আরো একবার তাঁর স্মৃতি চারণ করলেন, হার্ভার্ডের ত্রিশতবার্ষিকী উৎসবে।

আর নেভিল সাপ্তাহিক বিজ্ঞান পত্রিকা নেচারে (Nature) 1921 সালের বিশে জানুয়ারি সংখ্যায় স্মৃতিচারণ করলেন। "ভারি চমৎকার ব্যবহার ছিল তাঁর, সঙ্গী অতিথি হিসেবে আকর্ষণীয় ছিলেন তিনি! বন্ধুদের অনুগত যেন ছিলেন। আশ্চর্য ব্যক্তিগত রীতিতে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতেন; জানাতেন তাঁর প্রেমপ্রীতি ভালবাসা।

এই বিস্ময়কর গণিতজ্ঞটি ভালোলাগার ভালোবাসার মানুষ যে ছিলেন সেখানে সন্দেহ নেই।....তাঁর মৃত্যুতে ব্যক্তিগত ভাবে আমি শূণ্যতা অনুভব করছি। তবু তাঁর শেষ জীবনের কথা স্মরণ করেও বলতে পারি তার নিজের পূর্ণতার জন্য ইংলণ্ডে আসায় কোনো খেদের কারণ ঘটেনি। তার আশা সমূলে নষ্ট হলো বলে প্রোফেসার হার্ডি সর্বনাশের ইঙ্গিত দেখলেন। রামানুজন যদি দীর্ঘজীবন নিয়ে নিজের প্রতিভার আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে, সহমর্মী কোনো গণিতজ্ঞের সংস্পর্শে না এসে, আগে প্রমাণ করা সমস্যার সমাধানে মেতে থাকতেন, নিঃসঙ্গ একাকী—তবে প্রোফেসার হার্ডি নিশ্চয় বলতেন, সে হতো আরো করুণ ট্রাজেডি। তা যে ঘটেনি সে ভালোই !! ....অবসন্ন বিচলিত যখন তিনি, যখন ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ঠিক তার আগে একবার তিনি আমাকে বললেন, এখানে এসে যে ভালো হয়েছে, সেখানে তাঁর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, 1914 সালে মাদ্রাজে তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, যদি জানতেন সেই বাছাইটি একিলাসের, তবু তিনি সে পথে যেতে দ্বিধা করতেন না।"

রামানুজন সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো সুন্দর অনুভূতি প্রকাশ করলেন না হার্ডি। তাঁর কাছে April is the Cruellest month নিষ্ঠুরতম মাস হলো এপ্রিল। যে বসন্তের বাতাসে তিনি তাঁর আত্মার আত্মীয়কে হারালেন।—তবু রামানুজন তাঁকে ভাবায়, তাঁকে অস্থির করে, আবার তাঁর কাজে চোখ দিলে চোখ আনন্দে আলোয় জলে ভরে ওঠে। তিনি ভাবেন, রামানুজনের সব ভাবনা কি মৌলিক ? রজার্স-রীমানের গণিত তিনি নতুন করে খুঁজে পেলেন ! সে কি সত্যি ? "রামানুজনের বিচার নিয়ে যাই ভাবা যাক না কেন, তাঁর ধারণা নিয়ম গুলো সব যে চমৎকার তা অস্বীকার করা চলে না। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এ সবই কী তাঁর নিজস্ব ? যেমন, প্রশ্ন তোলা যায়, রীমানের সিরিজ কী তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছেন ?" হার্ডি তার পরেই দ্বিধাহীন হয়ে বললেন, 'আমার মতে, তিনি তাই করেছিলেন।' রামানুজনের পড়াশোনা কতটা ছিল ? রামানুজনের অবর্তমানে হার্ডি তাই নিয়ে ভাবেন। "মনে হয় না, রামানুজন হুইটেকার (Whillaker) বা ব্রোমউইচের (Bromwich) বই চোখে দেখেছিলেন। তবে তিনি ইলিপটিকেল ফাংশনের কোনো এক বই যে পড়েছিলেন তা নিশ্চয় করে বলা যায়। লিটলউডের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি সেই বই সম্ভবত গ্রীনহিলের (Greenhill)। বই নিয়ে আলোচনা করতে

তাঁকে শুনিনি। তাছাড়া কোনো প্রামাণ্য থিওরেমের নির্দেশ বা উল্লেখ তিনি করেন নি ; বরং মনে হতো সে সব তিনি নিজেই ভেবে বের করে ফেলেছেন! প্রচলিত তত্ত্বকে অন্যদিকে বিস্তৃত করেছেন বলে তিনি দাবি করেছেন, বলেননি ইলেপটিক ইনটিগ্রেল; থিটাফাংশন অথবা মডুলার ইকুয়েশন তাঁর উদ্ভাবন, আবিষ্কার। এরা যেন সাধারণ জ্ঞানের অংশ এমন একটা ধারণা তাঁর ছিল। তাঁর জ্ঞানের সীমা আর গভীরতা দুইছিল আশ্চর্য রকমের অসাধারণ। এই সীমা আর গভীরতার সাপেক্ষে মনে হয় তাঁর ধারণা যেন গ্রীনহিলের বইকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ;—তেমনি উদ্দীপক আর উৎকেন্দ্রিক!....আলোচনার উপসংহারে বলি, রামানুজনের সব কাজ যেমন অনুপ্রেরণায় বিভাসিত, তেমনি মামুলি ভুলেভরা—তবু তা স্বকীয়তায় ভরা, অন্যের সাহায্য ছাড়া গড়ে তোলা। অন্যকোনো ধারণার উপর নির্ভর করতে পারছি না। গণিতিক বা মনস্তাত্ত্বিক ছকে মিলিয়ে দেখতেও পারছি না। শেষের জের টেনে বলি, রীমানের আগে আর কেউ লেখেন নি $R(x)$; কাজেই রামানুজন যদি এইসিরিজ নিজের চিন্তায় পেয়ে থাকেন, তবে তাকে অদ্ভুত আশ্চর্য কাজ বলতে হবে। স্বয়ং গাউস $L(x)$ এ এসে থেমেছিলেন।"

যে প্রশ্ন নিরে হার্ডি ভাবছেন, সেই প্রশ্ন কেন জিজ্ঞেস করলেন না সেদিন? রামানুজন কে? হর্ডি লিখলেন, "আমি নিজেকেই দুষী করছি। এখন যা জানতে চাইছি, কত সহজে সেদিন তা জানতে পারতাম! তখন প্রতিদিনই রামানুজনকে দেখছি ; একটু আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের পালায় কত গোলমেলে ব্যাপার যে পরিষ্কার করে তুলতে পারতাম। সোজা প্রশ্নের উত্তর রামানুজন স্পষ্টকরে সোজা ভাষায় দিতেন, তাঁর কাজের মিস্টিকত্বের দোহাই মেনে এড়িয়ে যেতেন না। অথচ কোনো দিন এসব বিষয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করিনি ; কার্লাইল বা গ্রীনহিলের ইলিপটিকেল ফাংশনের বই তিনি দেখেছিলেন কিনা সে প্রশ্নও তুলিনি।....এ সব ভেবে আমার এখন দুঃখ হয়। তবু, মনে হয় এসব চিন্তা অপ্রয়োজনীয়, আর তখন যা ঘটেছে তাই ছিল স্বাভাবিক। সেদিন ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি রামানুজন মারা যাবেন। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার স্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ আবেগ দেখিনি। গণিতজ্ঞ তিনি, পণিত নিয়ে মেতে থাকতে চাইতেন। তাছাড়া আমিও তো গণিতবিদ। একজন গণিতবিদের রামানুজনের সঙ্গে মোলাকাত হলে ইতিহাস টিতিহাসের গবেষণা ছাড়া অন্য আগ্রহ কৌতূহলও তো

থাকে। সেদিন প্রতিদিন প্রায় আধডজন নতুন কাজ নিয়ে আমাকে দেখাচ্ছেন, তখন আমাদের চেনাজানা থিওরেমের এটা সেটা তিনি কীভাবে পেলেন সেই প্রশ্ন তোলা নেহাৎ অবান্তর।"

দুকূল প্লাবী ভরা বর্ষার গঙ্গা দেখে কোনোদিন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেনা, নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?—সেই প্রশ্নের জন্য সুস্থিতি স্থৈর্যের প্রয়োজন। পাঁচবছরের অন্তরঙ্গ ফল ফলাবার দিনগুলিতে রামানুজন হার্ডিকে সেই স্থৈর্যস্থিতির সুযোগ দেননি। প্রতিদিন আধ-ডজন নতুন নতুন সমস্যা আর সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি। সেই তাঁর নজরানা। একঘেয়েমি নেই, একমুখীনতা নেই। সেই বিস্ময়ের সামনে মানুষ প্রশ্ন তুলতে পারে না। হার্ডিও পারেন নি। যতদিন কাছে ছিলেন রামানুজন,—তাঁর কাজের স্রোতের ধাক্কায় হার্ডি হাবুডুবু খেয়েছেন। দেখেছেন আরো একজন অয়লার বা জেকবিকে —সেই অপর্যাপ্ত প্রাচুর্যের উত্তরাধিকারীকে। প্রশ্ন তিনি খুঁজে পেলেন সেদিন, যেদিন স্রোত থেমে গেল। তখন জানতে ইচ্ছে হলো, কোথায় এই স্রোতের উৎস। সেদিন উত্তর দেবার জন্য কেউ ছিল না। উত্তর জানা হয় না।

এই বানভাসির কাল থামায় শুধু মৃত্যু। নইলে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণটি রোগশয্যায় শুয়ে বসে মকথিটা ফাংশনের কথা ভাবতে পারলেন। প্রফেসার ওয়াটসন বিস্মিত হয়ে বললেন, "রামানুজনের মকথিটা ফাংশনের আবিষ্কার প্রমাণ করছে যে তাঁর অকাল মৃত্যুর হাতছানিতেও তাঁর কুশল উদ্ভাবনী দক্ষতা অন্তর্ধান করেনি। তাঁর আগের কাজের তুলনা টেনে বলা যায়, মকথিটা ফাংশন কাজের জন্যও তাঁর নাম স্মৃতিতে চিরজাগরূক থাকবে। এই আবিষ্কার জানি তাঁর ছাত্রদের কাছে আনন্দের বিস্ময়ের উৎস হয়ে থাকবে ততদিন; যেদিন আমরাও প্রোসারপিনের (Proserpine) বাগানের দিকে যাত্রা শুরু করব। যেখানে

Pale, beyond porch and portal
Crowned with calm leaves she stands
who gathers all things mortal
With cold immortal hands.

[তোরণ অলিন্দ পেরিয়ে, শান্ত পাতার মুকুট শিরে নিয়ে
সেই বিবর্ণা নারী দাঁড়িয়ে আছেন

অধ্যায় ঃ সাত

আক্ষেপানুরাগ (নোটবই)

রামানুজনের উপর বারোটি বক্তৃতার এক জায়গায় হার্ডি বললেন, "রামানুজনের কাজ কতটা প্রয়োজনের, সেইকাজ বিচার করার মান নির্দেশ, অথবা, ভবিষ্যতের গণিতের উপর তার কাজের প্রভাব— এসব নিয়ে মত বিরোধ থাকতে পারে। মহান কাজে যে ধরণের সরলতা অথবা অপরিহার্যতা দেখা দেয়, এসব কাজে তার অভাব আছে, মানি। এত ভিন্ন ধরণের না হলে হয়তো এ সব কাজ আরো বিশিষ্টতর মহত্তর হতে পারতো। তবু, এই কাজের একটি বিষয়ে সকলে যেখানে একমত হবেন তা হলো এগুলির অকাট্য ও গভীর মৌলিকতা! যৌবনের শুরুতে নিয়ম শৃঙ্খলার পথে তাঁকে যদি কিছুটা শিক্ষা দেওয়া যেতো, তবে আরো বড় গণিতজ্ঞ হয়তো হতে পারতেন। হয়তো তখন আরো নতুন কিছুবা আবিষ্কারও করতে পারতেন, আর সেসব কত যে কাজের হতো! অন্যদিকে, তিনি হতেন বড় বেশি রকমের ইউরোপীয় অধ্যাপক এবং অনেক কম রামানুজন! লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই বেশি হয়তো হতো!"

রামানুজনের নোটবই নিয়ে বর্তমানে যিনি কাজ করছেন সেই অধ্যাপক ব্রুস বার্ণট্ (Bruce Berndt) একই মতে বিশ্বাসী। তিনি জানালেন, "প্রথাগত শিক্ষা পেলে হয়তো নিজের 'মৌলিক পদ্ধতির' উপর এত বেশি নির্ভর করতেন না রামানুজন। সেই মৌলিক পদ্ধতি— যা নিয়ে ছিল তাঁর অহঙ্কার, যাকে লুকিয়ে আগলে রেখে এলেন চিরকাল। ...একজন সুশিক্ষিত গণিতজ্ঞের মন নিয়ে ভাবলে এত বেশি ফর্মুলা লিখে যেতেন না।—তিনি ভেবেছিলেন এদের তিনি প্রমাণ করেছেন, অথচ আদৌ কোনো প্রমাণই দেন নি। তবু ইতিহাসের পথ অন্যরকম হলে গণিত কিন্তু দরিদ্র হতো।"

হার্ডি থেকে বার্ণট্—যাঁরাই রামানুজনের গণিতের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের মননে একটি চিন্তা বারবার হাজির হয়েছে ;—এই অদীক্ষিত অসম্ভব অবাস্তব মৌলিক চিন্তার অধিকারী রামানুজন আর

ইউরোপীয় শিক্ষা ধারায় শিক্ষিত সুশৃঙখলিত সুনিয়ন্ত্রিত গণিতজ্ঞ রামানুজন—গণিতক্ষেত্রে কোনটি বেশি ফলপ্রসূ হতো ?—হার্ডি রমানুজনকে রামানুজন হিসেবে পছন্দ করেছেন। বার্ণট ইতিহাসের অন্যরূপ চাননি। চেনাজানা গণিতজ্ঞের তুলনায় অবোধ্য রামানুজন যে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং—সেখানে সব গণিতজ্ঞেরা একমত। নেভিলের কথা উদ্ধৃত করে তাঁরা বলেছেন, বলছেন এবং নিশ্চয় বলবেন, বিস্ময়কর গণিতজ্ঞটি বড় ভালোলাগার, ভালোবাসার !

তাঁর কাজের সূত্র ধরে মানুষটি আজো আমাদের কাছে সজীব হয়ে আছেন। সেই কাজ ছড়িয়ে আছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা তিনটি রিপোর্টে, ভারতীয় গণিত সমাজের জার্ণালে প্রকাশিত চারটি নিবন্ধে, হার্ডিকে লেখা চিঠি কয়টিতে, ইংলণ্ডে বাসকালীন প্রকাশিত সাতাশটি গবেষণাপত্রে, যার সাতটি হার্ডির সহায়তায় লেখা, এবং সবার উপরে তাঁর নোটবই তিনটিতে, অপ্রকাশিত অধুনালব্ধ কয়েকটি খাতার পাতায়। তাঁর রিপোর্ট, প্রকাশিত গবেষণাপত্র, হার্ডিকে লেখা চিঠি—এসব খোলা পাতার মতো সকলের সামনে পড়ে আছে। এরা চেনা জানা। এদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিচার হয়েছে। এরা অদ্ভুত হলেও অবোধ্য নয়। অথচ তাঁর নোটবই ! যা তিনি বহুবার বহুজনকে দেখিয়েছেন, যা নেভিলকে দিতে চেয়েছিলেন—সেখানে যে গণিতের সম্ভার তিনি রেখে গেছেন, তা যেন এক অজানা মনির খনি ! আসল রামানুজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে এই নোটবই কটিতে—সেই অদীক্ষিত, স্বশিক্ষিত, আশ্চর্য গণিতবিদ তাঁর রহস্যের ব্যাঞ্জনা নিয়ে এইখানে আছেন—তাঁর নোট বইয়ে। হনুজ অস্ত্ ওয়া হনুজ অস্ত্ !

কারের বইএর সমস্যা কটি সমাধান করতে নেমে তিনি এক নতুন জগতে পা দিয়েছিলেন। পাঠ্য সব বিষয় ভুলে সেই রাজ্যের অনুপুঙ্খটি অভিযাত্রীর মতো জানতে চাইলেন। সেই রাজ্যের ভাষা তাঁর জানা নেই, জানেন না তার ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, সংস্কৃতি। অথচ অনুসন্ধিৎসু অভিযাত্রীটি একা একা নিজের চেষ্টায় সেই রাজ্যের তত্ত্ব তালাসে নামলেন, হদ্দহদিশ খুঁজলেন। আর তখনই তাঁর খোঁজার ইতিবৃত্তটি লিখে রাখতে শুরু করলেন। অভিযানের নেশায় মত্ততায় তিনি আর সব কিছু ভুললেন। দারিদ্র্যের খোঁচা বারবার আঘাতে নেমেছে, বাবা শ্রীনিবাসন বকাঝকা করেছেন। তিনি কান দেন নি। গণিতের অমোঘটানে হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া নৌকো নিয়ে ভেসে ভেসে দৃশ্য থেকে

দশ্যান্তরের সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে বিভোর হয়ে থেকেছেন। অঙ্ক কষেছেন শ্লেটে। আর সমস্যা আর সমাধানটুকু শুধু কাগজ বাঁচাতে লিখে রাখলেন নোট বইয়ে। এই তার শুরু। তারপর বেহুঁশ ছেলেকে সংসারের দিকে ফেরাতে বাবা তাঁর বিয়ে দিলেন। তখন খেয়াল হয় সংসারে পরনির্ভর হয়ে শুধু নেশা নিয়ে থাকা হয়তো যায়—তবে মানুষের কাছে তা অসম্মানের। তাছাড়া যে সংসার তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে অথবা টিঁকিয়ে রেখেছে তারও দাবি থাকে—যে দাবি মানুষকে পূর্ণ করতে হয়। অতএব মোটামুটি রোজগার করা দরকার। দরকার একটি চাকরির। সেই নোট বই তখন হলো তাঁর সার্টিফিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সচেতন সমাজে, কোনো ডিগ্রি ছাড়া মানুষের ভদ্র গোছের কাজের অধিকার নেই। সেই অধিকারটি পেতে হলে দরকার তদ্বিরের, দরকার সুপারিশের। এই তদ্বির-সুপারিশ যাঁরা করবেন তাঁদের কাছে তাঁর কাজের সার্টিফিকেট হলো ঐ নোট বুক। যা ছিল তাঁর একান্ত গোপন, আপন—তাকে বাইরে দেখিয়ে কাজ জোগার করতে হবে। ...একটি সিরিওকমিক নাটক সৃষ্টি করলেন রামানুজন !

নোটবই তাঁর অভিযানের ডায়রি, আবার নোটবই তাঁর নিজের কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকে। প্রথম যৌবনে নোটবই লেখার সময় তাঁর আদর্শ ছিল কার। চ্যাপ্টারে, অধ্যায়ে নোটবই ভাগ করা। প্রথম অধ্যায়টি আকারে ছোট—ম্যাজিক স্কোয়ার নিয়ে লেখা। দেখলেই বোঝা যায়, তিনি অঙ্কনিয়ে খেলতে বসেছেন, অঙ্কে মজা পাচ্ছেন। তবে সেই খেলা সব ভোলা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রথমদিকে এক পৃষ্টায় লিখে গেছেন। বেশ স্পষ্ট মাঝারি হরফে লেখা ; কারের গণিত বইটির মতো এখানে আছে শুধু সমস্যা-সমাধান। নেই ব্যাখ্যা বা প্রমাণ। প্রথম 136টি পৃষ্টায় 16টি অধ্যায় লিখে গেলেন। ঠাসবুনুনি লেখা। মনে হয় তিনি কাগজ সংগ্রহে অসমর্থ বলে এক পৃষ্ঠায় যতটা লেখাযায় ততটাই লিখে যেতে চাইছেন। এরপর থেকে, 137 পৃষ্ঠা থেকে একটি পাতার দুদিকে লিখে গেলেন—এখানে তিনি অধ্যায় নিয়ে ভাঙাভাঙিতে আর গেলেন না। পরের একশ'র মতো পাতায় হঠাৎ হঠাৎ এসেছে হাইপারজিওমেট্রিক সিরিজের ফর্মুলা, কনটিনিউড ফ্র্যাকসন, সিঙ্গুলার মডুলি ইত্যাদি। অর্থাৎ যেমন মনে এসেছে তেমনি লিখে গেছেন—যেন এক ব্যক্তিগত ডায়রি। এরপর আগের 136 পৃষ্ঠার পেছন দিকের শাদা অংশে নতুন নতুন ফর্মুলা-গণিত লিখে যেতে লাগলেন। সেখানেও সেই পাঁচমিশালি রীতি দেখা যায় ; হাইপারজিওমেট্রিক

সরিজের পাশে এসেছে q-সিরিজ ; তার পাশে আছে কন্টিনিউড ফ্র্যাকসন অথবা ইলিপটিকেল ইনটিগ্রাল। নোটবইয়ের এই ওমনি-বাসটি তাঁর মনে যারা ভিড় করে এসেছে তাদের ঠিকানা নিয়ে যেন গড়ে ওঠে। তাঁর ধারণাগুলি ঋজুশাখ নয় ; পল্লবিত যেন! অথচ নতুনবর্ষার জলে ভিজে কী দ্রুত তাদের বৃদ্ধি।

এই প্রথম নোটবইটি—যাকে বলা হয় একনম্বর নোটবই বা নোটবই-ওয়ান—এখানে শৃঙ্খলা নেই। বড় অমার্জিত এটির গঠন প্রকৃতি। অতএব সার্টিফিকেট হিসেবে গুণীজনের কাছে এটি পেশ করতে ইতস্তত বোধ জাগে। এই সময়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় নোটবইটি লিখতে শুরু করলেন, যাকে বলা হয় নোটবই-টু যেটি হলো নোটবই ওয়ানের সংশোধিত-সম্প্রসারিত নবসংস্করণ। নোটবই ওয়ানের 30-31 পৃষ্ঠায় বার্ণোলির সংখ্যা নিয়ে আলোচনা—যা তিনি 1911 সালে ভারতীয় গণিত সমাজের জার্ণালে প্রকাশ করেছিলেন। এই গণিত স্থান পেয়েছে নোটবই টু এর শেষ দিকে। মোটামুটি নোটবই ওয়ানের প্রায় সব গণিত নোটবই টুয়ে ঠাঁই পেয়েছে—একুশটি অধ্যায়ে এদের তিনি বিবৃত করলেন। আবার এই একুশতম অধ্যায়ে এসে তিনি সব কিছু আবার মিশিয়ে ফেললেন—নানা ধরণের গণিত আবার মিছিল করে হাজির হয়—সেখানে পুরনো অধ্যায়ের জের বা নতুন চিন্তার চমক দুটিই চমৎকার সহাবস্থানে থেকে গেছে। প্রথম নোট-বইটিতে ছিল 212টি পৃষ্ঠা। আর দ্বিতীয় নোটবইটিতে সবকিছু একপৃষ্ঠায় লেখা—পৃষ্ঠাসংখ্যা 351।

শেষজীবনের কিছু কিছু কাজ হার্ডিকে পাঠিয়েছিলেন। অথবা কিছু কাজ কেম্ব্রিজে করেছিলেন, যার হদিশ জানতেন শুধু হার্ডি। এই সব কাজের খবর নোটবইয়ে নেই। পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জর্জ এন্ড্রুস (George Andrews) গতদশকে ট্রিনিটি কলেজের লাইব্রেরিতে এইসব অপ্রকাশিত গণিতভাবনার একটি ফাইল আবিষ্কার করে এর নাম দিলেম রামানুজনের নোটবই—লস্ট নোটবুক। ট্রিনিটি কলেজের লাইব্রেরিয়ান অবশ্য এইনামে ঘোরতর আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে এই ফাইল লাইব্রেরিতে যখন ছিল তখন একে বলা যায় না লস্ট-হারানো। তাছাড়া ফাইল কি করে নোটবই হবে? তবু রামানুজনের অপ্রকাশিত সব কাজেই নোটবই এর আখ্যা পেয়ে চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় নোটবই ছাড়া, তৃতীয় আরেকটি নোটবই পাওয়া যায়—যেটি

দ্বিতীয় নোটবই শেষ হবার পর, রামানুজন সম্ভবত লেখালেখির জন্য খোলেন। তবে এর অধিকাংশ পৃষ্ঠা সাদা, শুধু তেত্রিশটি পৃষ্ঠা গণিতে ঠাসা। এটিকে বলা হলো নোটই থ্রি বা তৃতীয় নোটবই।

ইতিমধ্যে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে রামানুজনের প্রকাশিত গবেষণা পত্রের একটি সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ হলো, সম্পাদনায় আছেন হার্ডি। এই বইটিতে রামানুজনের প্রথম জীবনী প্রকাশিত হলো, লেখক সেশু আয়ার ; তাছাড়া অধ্যাপক উইলসনের আলোচনাও থাকে। শেষমেশ রামানুজনের গবেষণা পত্র সংকলনের (Collected papers of Srinivasa Ramanujan) এর সম্পাদক হিসেবে নাম থাকে হার্ডি, সেশু আয়ার ও উইলসনের।—রামানুজনের কাজের পরিচিতি হিসেবে গতদশকের আগে পর্যন্ত জানা ছিল, কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থটি ও তাঁর তিনটি নোটবই যার পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে 212, 352 এবং 33।

আটের দশকে অধ্যাপক বার্ণট রামানুজনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জানকীদেবী তাঁকে জানালেন, রোগ শয্যাতেও রামানুজন গণিত নিয়ে লেখালেখি করে গেছেন। সেসব কাগজ একটা ট্রাঙ্কে ভরা থাকতো। জানকী বললেন, রামানুজনের শেষকৃত্যকালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রামানুজনের কলেজ জীবনের শিক্ষক বাড়িতে এসে সেইসব কাগজপত্র নিয়ে চলে যান। বার্ণট ভাবেন, শেষ কটি দিনে রামানুজন যে গবেষণা করে গেছেন তার প্রমাণ হার্ডিকে লেখা চিঠি ও মক থিটা ফাংশনের ঘোষণা। কাজেই আরো কাজ থাকতে পারে। তবে এই কাগজপত্রের খোঁজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান জানিয়েছেন, তন্নতন্ন করে খুঁজে তিনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে রামানুজনের কোনো গবেষণাপত্র—পেপার নেই। বার্ণট তবু সংশয় টেনে নিয়ে আছেন।—বার্ণট যখন জানকীর সঙ্গে দেখা করেন, তখন তাঁর বয়স যে সাতাশি সেকথা জানকী স্বয়ং বলেছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি অনেক ব্যাপারে তখনো অটুট। তবু, তাঁর এই বক্তব্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রতিনিধির কথা জানকী বললেন, তিনি তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী হয়তো বা হবেন সেশু আয়ার,—যে মানুষটি রামানুজনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্লান্তিহীন চেষ্টা করে গেলেন সেই সেশু আয়ার। সেশু আয়ার অত্যন্ত ছিমছাম শৃঙ্খলা পরায়ণ মানুষ

ছিলেন। তিনি যে রামানুজনের লেখা কাগজপত্র নিতান্ত দায়িত্বহীনের মতো হারিয়ে ফেলবেন—সে কথা ভাবা যায়না। তাঁর লেখা জীবনীতেও এ জাতীয় কাগজপত্রের উল্লেখ নেই।—তবে তিনি কি অন্য কোনোজন. যাঁকে জানকী সেশু আয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন ?—পেপার সত্যি কি ছিল ?·······বার্ণট মনে করেন শেষ জীবনের আরো কিছু কাজ ছিল—যা হারিয়ে গেছে। কারণ গাউসের মতো রামানুজন তাঁর অনেক কাজ প্রকাশ না করে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রামানুজনের সব গবেষণাপত্র পাওয় যায়নি, তাঁর কাজের যে প্রকাশিত রূপ তা, বর্ণাটের মতে, অসম্পূর্ণ। তবু যা রেখে গেছেন তা পরবর্তী যুগের গবেষকদের বহুবর্ষের সাধনার উপকরণ, বিষয় !

ইংলণ্ডে যাবার সময় রামানুজন প্রথম দুটি নোটবই (অথবা তিনটিই) সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আবার যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন, তখন প্রথম নোটবইটি হার্ডির হাতে দিয়ে এলেন. রামানুজনের মৃত্যুর তিনবছর পর, 1923 সালে এই নোটবইটির দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন হার্ডি ; দেখালেন হাইপার জিওমেট্রিক সিরিজের অধিকাংশ থিওরেমই রামানুজন পুনরাবিষ্কার করেছেন ; পেয়েছেন সেইসব সিরিজ যাদের খোঁজ জানিয়েছিলেন ডুগল (Dougall), সালশুৎস (Saalschutz), ডিকসন (Dixon), কমার (Kummer), টমাস (Thomas) ও অন্যান্যরা। তাছাড়া নতুন সিরিজের খোঁজও পেলেন। রামানুজন কি পূর্বসূরীর ঋণ স্বীকার করেন নি ?—হার্ডি আলোচনায় যে ইঙ্গিত দিলেন, তার বিশদ বর্ণনা টি এস এলিয়ট তাঁর প্রবন্ধে বললেন, "one of the surest test is the way in which a poet borrows. Immature poets ; imitate ; mature poets steal ; bad poets deface, what they take ; and good poets make it into something better or at least something equal." (একটি সুনিশ্চিত পরীক্ষা হলো কবিরা কীভাবে ঋণ নিয়েছে, তা বোঝা। কাঁচা কবিরা নকল করবে ; পাকা কবি চুরিই করবে ; বাজে কবি যা নিলো, তাকে নষ্ট করবে ; আর যে কবি ভালো সে যা নিয়েছে তার চেয়ে ভালো অথবা অন্তত তারই সমকক্ষ কিছু সৃষ্টি কববে।)—রামানুজন নতুন সিরিজ সৃষ্টি করলেন, যা পুরনো সিরিজের সমকক্ষ শুধু নয়, অনেক বিস্ময়ের ! তাছাড়া, হার্ডি অন্তত মনে করেন, পুরনো সিরিজকটি রামানুজন পুনরাবিষ্কার করেছেন ; এখানে

তিনি ঋণী নন। বরং বলা চলে, হাইপার জিওমেট্রি সিরিজের প্রথম উপপাদ্যের নিজস্ব প্রমাণ দিয়ে তিনি ধাপে ধাপে নিজের সৃষ্টি নতুন উপপাদ্যের দ্বারে পৌঁছুলেন। কী দ্রুত সেই উঠে আসা! 1812 সালে গাউসের করা হাইপার জিওমেট্রি সিরিজের ধাপ থেকে সোজা যেখানে 1912-13 সালে পৌঁছুলেন, সেই ধাপে অন্য গণিতজ্ঞদের আসতে আরো কয়েকটি দশক লাগে!

হার্ডির লেখাটি প্রকাশিত হবার পর, রামানুজনের নোটবই নিয়ে কৌতূহল জাগে। নোটবইটি তখন হার্ডির কাছে নেই, তিনি মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়কে পাঠিয়ে দিয়েছেন নোটবুক ওয়ান। পরে হার্ডি ও ওয়াটসনের অনুরোধ মাদ্রাজ ক্রিস্টিয়ান কলেজের লেকচারার টি এ. সতগোপালন নোটবই তিনটির হুবহু কপি করে ওয়াটসনের কাছে পাঠিয়ে দেন। মূল তিনটি নোটবই মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির ভল্টে সংরক্ষিত থাকে। সেখানে কারুর প্রবেশ অধিকার নেই!........ 1957 সালে নোটবই তিনটির ফটোকপি প্রকাশ করলেন বোম্বের টাটা ইনস্টিট্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ। দুই খণ্ডে প্রকাশ হলো—প্রথম খণ্ডে শুধু নোটবুক ওয়ান ও দ্বিতীয় খণ্ডে বাকি দুটি।—রামানুজনের নোটবই সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

এই নোটবই সম্পর্কে 1931 সালে লণ্ডন ম্যাথেমেটিকেল সোসাইটিতে অধ্যাপক ওয়াটসন একটি ভাষণ পাঠ করলেন! প্রথমেই রামানুজনের গবেষণার বিশাল বিস্তৃতির দিকে ইঙ্গিত করে জানালেন, নোটবইয়ের বিষয়ের যে বিভিন্নতা আর গভীরতা চোখে পড়ে তার বর্ননা একটি বক্তৃতায় জানানো সম্ভব নয়। তিনি বললেন, "মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গত আঠারোমাস ধরে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বি এম উইলসনের (B.M, Wilson) সহযোগিতায় নোট-বইকটি প্রকাশের যোগ্য করতে সম্পাদনার কাজে নেমেছি। প্রাথমিক ভাবে কাজটি দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করে আমরা দুজনে, বলতে গেলে, স্বাধীনভাবে কাজটা করছি। কাজেই নোটবইয়ের এমন অনেক অংশ আছে যেখানে আমার জ্ঞান যৎসামান্য। সুতরাং আমার জানা একপেশে অংশটুকুই বর্তমানে বর্ণনা করতে আমি সক্ষম।....... তাঁর স্কুলজীবন থেকে রামানুজন যে নোটবইকটিতে তাঁর আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেকটি আছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হেফাজতে। সার গিলবার্ট ওয়াকার আমাকে বলেছিলেন, সেই 1912 সালে কালো মলাট

দেওয়া ইঞ্চিখানেক মোটা চার পাঁচটি খাতা তিনি দেখেছিলেন। আবার প্রফেসার হার্ডি জানিয়েছেন, 1919 সালে ভারতবর্ষে ফেরার সময়, রামানুজন একটি মাত্র বই রেখে গিয়েছিলেন ; এই বইটির যে বর্ননা প্রফেসার হার্ডি দিয়েছেন তা নিশ্চয় আমার কপিটির মূল—এটিকে আমি 'প্রথম সংস্করণ' নোটবই বলছি। সম্ভবত সার গিলবার্ট ওয়াকার যে সব বই দেখেছিলেন, তারই সংকলন হলো এই 'প্রথম সংস্করণ'। এছাড়া আরো একটি নোটবই—'দ্বিতীয় সংস্করণ' যাকে বলছি, তার অস্তিত্ব আছে, আমার কাছে তার কপিও আছে। এই দুটি সংস্করণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি।

"প্রথম সংস্করণের কপিটির লেখক হলেন মাদ্রাজ ক্রিস্টিয়ান কলেজের লেকচারার টি এ সতগোপালন (T. A. Satagopalan) ; —হার্ডির কাছে রক্ষিত বইটির বিনিময়ে এই কপিটি হার্ডিকে পাঠানো হয়। লেখক মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পৃষ্ঠাংকটি বজায় রেখেছেন বলে জানিয়েছেন। হার্ডি বলেছেন, মল নোটবইটি অদ্ভুত এক সবুজ কালিতে লেখা। প্রথম 134 (?) পৃষ্ঠা মোটামুটি ষোলোটি অধ্যায়ে সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে সাজানো। 132 (?) থেকে 213 (?) পৃষ্ঠা জুড়ে আছে নানাধর্মী বিভিন্ন বিষয়ের মিছিল। প্রথমদিকে বাঁদিকে পৃষ্ঠা খালি রাখাছিল ; পরে এখানে অনেক কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা হয়েছে। কাজেই মূল পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা তিনশ'র যে বেশি তা বলা যায়। এই বইটি শ্রীসতগোপালন ফুলস্কেপ কাগজের 356 পৃষ্ঠায় টানা বড় বড় হরফে কপি করেছেন।

"দ্বিতীয় সংস্করণের যে কপি অধ্যাপক হার্ডি পেয়েছেন তা চারটি 140 পৃষ্ঠার খাতা। এথেকে নিজের কাজের সুবিধের জন্য ফুলস্কেপ কাগজের 288 পৃষ্ঠায় আমি টানা হাতে কপি করে নিয়েছি।...... বোঝা যাচ্ছে, ডঃ উইলসন এবং আমি যে কাজটা হাতে নিয়েছি—প্রায় তিন চার হাজার থিওরেমের প্রমাণ—তাকে কোনো ভাবেই হালকা ভাবা চলে না। পূর্বসূরীদের হাতে আগেই প্রমাণ করা থিওরেমগুলো প্রতিষ্ঠা করেও সব কাজ শেষ করতে পাঁচ বছর লাগবে বলে আমাদের ধারণা।"

উইলসন ও ওয়াটসন নোটবইয়ের অধ্যায় কটি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। ঠিক হয় নেটবইয়ের প্রথম অধ্যায়গুলির সম্পাদনা করবেন উইলসন আর পরের গুলি করবেন ওয়াটসন। দুর্ভাগ্য বশত হার্নিয়া অপারেশনের পর উইলসন 18ই মার্চ 1935 সালে

মারা যান। একা ওয়াটসন 1940 সাল পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান; প্রায় দুডজন গবেষণা পত্রও প্রকাশ করেন। তারপর যেন ইন্টারেস্ট হারা হয়ে থেমে যান। "জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলতে, গণিত গবেষণার উৎস হিসাবে" যে নোটবইকটির সম্পাদনা দরকার বলে হার্ডি মনে-করেছিলেন, 1929 সালে উইলসন-ওয়াটসন সেই কাজ হাতে নিলেও 1940 সালে অসম্পূর্ণ অবস্থায় কাজটি পড়ে থাকে। 1949 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় নোটবই তিনটির ফটোকপি তৈরি করার পর 1957 সালে বিজ্ঞানী ভাবার প্রচেষ্টায় টাটা ইনস্টিট্যুট দুটি খণ্ডে নোটবই তিনটি প্রকাশ করলেন। আরো কিছুদিন যায়। 1978 সালে ব্রুস বার্নট নোটবইকটি নিয়ে একটি চমৎকার নিবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই বার্নট বহু গণিতবিদের সহযোগিতায় রামানুজনের দ্বিতীয় নোটবইটির একুশটি অধ্যায় বিশদভাবে সম্পদনা করে প্রকাশে নামলেন। 1985 সালে তার প্রথমখণ্ডটি প্রকাশিত হলো। আরো একটি অসাধারণ নিবন্ধ পাওয়া গেল 1981 সালে, অধ্যাপক রেঙ্কিন (R. A. Rankin) লণ্ডনের গণিত সমাজের মুখপত্রে প্রকাশ করলেন রামানুজনের পাণ্ডুলিপি ও নোটবই নামে চমৎকার একটি আলোচনা।

নোটবইকটি চমৎকার। তবু ভয়ের। ভয়ের কারণটি বার্নট জানালেন। উইলসনের লেখা থেকে জানা যায় জর্জ পলিয়া (George Polya) রামানুজনের ফর্মুলা পড়ে মুগ্ধ। 1925 সালে একদিন অক্সফোর্ড্যে এলেন পালিয়া। হার্ডির কাছ থেকে দিনকয়েকের জন রামানুজনের নোটবইটি পড়বেন বলে ধার নিলেন তিনি। দুদিন পরে অবিন্যস্ত বিপর্যস্ত পলিয়া হার্ডিকে নোটবই ফেরৎ দিয়ে গেলেন। তিনি রাখতে চান না। নোটবই কাছে থাকলে তিনি রামানুজনের ফর্মুলা প্রমাণ করতে থাকবেন—নিজে আর কোনো মৌলিক কাজ করতে পারবেন না!

1976 সালে, জর্জ এনড্রুস, লস্ট নোটবুক আবিষ্কার করেন। তিনি প্রায় 130 পৃষ্ঠার মতো নানা লেখা পেলেন। এগুলি, সবকটি, ইংলণ্ডের শেষের দিকে তাঁর কাজ, এবং ভারতবর্ষ থেকে হার্ডিকে পাঠানো তাঁর গবেষণাপত্র। এই সব গবেষণাপত্র সম্পাদনার কাজে নেমেছেন এনড্রুস; সঙ্গে উইসকনসিন (Wisconsin) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড আস্কে (Richard Askey)। অবাক আস্কে দেখেন, "মুমূর্ষু মানুষটির শেষ একবছরের যে কাজ তা যে কোনো বড় মাপের

গণিতবিদের সারা জীবনের কাজের সমান।....গণিতবিদ হিসেবে রামানুজন যে মহান তা শুধু নয়, তাঁর কাছ থেকে আমরা জানলাম মানুষের মন কী না করতে পারে। ওঁর মতো শক্তিমান লোক শুধু দুর্লভ নয়, মূল্যহীনও।"

রামানুজনের মূল্য স্থির করতে নামলেন হার্ডি। হাঙ্গেরির গণিতবিদ পল ইরডোস **(Paul Erdos)** সে গল্প বলেছেন। হার্ডি বললেন, গণিতবিদের সমকালীন মনীষাকে যদি শূন্য থেকে একশ এই স্কেলে মাপা হয়, তবে হার্ডি নিজে পাবেন পঁচিশ, লিটলউড তিরিশ, বিখ্যাত গোটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞ হিলবার্ট পাবেন আশি; আর রামানুজন পাবেন একশ'তে একশ।

সমকালীন গণিতবিদদের চোখে রামানুজন একশ'তে একশ পাবারই অধিকারী।

অথচ এই মানুষটি কৈশোর যৌবনে শ্লেটে অঙ্ক কষলেন, ভুল হলে কনুই দিয়ে অনায়াসে মুছে নিলেন, আবার অঙ্ক কষা, আর যখন শেষ উত্তর পাওয়া গেল, নিশ্চিন্তে নিরুদ্বিগ্ন মনে নোটবইয়ে শুধু সমস্যা আর সমাধানটুকু লিখে রাখলেন। ভবিষ্যতের গণিতবিদদের হাতে রইলো নোটবইয়ের দেনা শোধ করার ভার! নোটবইয়ে যা আছে তা শুধু ফর্মুলা। সেই ফর্মুলা দেখে হার্ডি অবাক হয়ে বলেছিলেন,—এমনটি আর তিনি কখনো দেখেননি। এক লহমা দেখেই বলা চলে অতি উঁচুমাপের গণিতজ্ঞের হাতের কাজ এখানে স্পষ্ট। এগুলো নিশ্চয় খাঁটি; কারণ সঠিক বা খাঁটি না হলে কেমন করে মানুষের কল্পনায় এরা সাড়া জাগালো?

বার্নট 1987 সালে দ্বিতীয় নোটবইয়ের একুশটি অধ্যায়ের যাবতীয় ফর্মুলার প্রমাণ দিয়ে বললেন, এগুলো এখন ভবিষ্যতের গণিতবিদদের বহুদিনের খোরাক। তবু রামানুজন এই পথেই কি ভেবেছিলেন? বার্নটের সঙ্গী ভাবেন যেহেতু প্রমাণ ছাড়া কারের বইয়ের সমস্যা রামানুজনের কাছে সমস্যাই মনে হয়নি, তাই বুঝিবা, তিনি প্রমাণ ছাড়া নিজের গড়া সমস্যা-সমাধান লিখে রেখে গেলেন। ভাবলেন না—সবাই রামানুজন হতে পারে না।—নোটবই দেখে বার্নটরা প্রতিপদে অবাক হলেন। 1979 সালে ফরাসী গণিতজ্ঞ আপেরি (Apery) একটি মান $\zeta(3)$ এর সমস্যা সমাধান করলেন। ঐ মানটি

একটি অসীম সিরিজ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হলো, যে সংখ্যায় সিরিজটি সমকেন্দ্রী (Converge) হবে সেটি মূলদ রাশি না অমূলদ (Rational or Irrational)। আপেরি এটিকে 'দুটি সুন্দর ধারণার' সাহায্যে অমূলদ বলে প্রমাণ করলেন। বার্নট বললেন তার একটি রীতি হলো রামানুজনের নোটবইয়ের একটি সাধারণ কন্টিনিউড ফ্যাকশনের বিশেষ রূপ!

রামানুজনের নোটবইয়ের প্রমাণ এখন অনেক গণিতবিদের বর্তমানের মৌলিক কাজের উপহাস যেন! যেমন উইলিয়াম গোসপার (W. Gosper) রামানুজনকে বললেন, 'নেমেসিস'—প্রতিরোধী। বললেন, "যে লোকটা কবর থেকে হাত বাড়িয়ে আমাদের কাজের সুফল ছিনিয়ে নিতে আছে তাকে কি করে ভালোবাসি?....বেঁচে থাকলে আমার কম্পুটারটা ওঁর হাতে দিয়ে ওঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সরিয়ে আনতাম।"...গোসপার মনে করেন, কম্পুটারের সঙ্গে একমাত্র রামানুজন অঙ্ক কষার লড়াইয়ে নামতে পারতেন!

নোটবইয়ের ব্যাখ্যা পেয়ে রামানুজনের পুনর্মূল্যায়ন ঘটে যায়। সমকালীন নিরীখে একশ'র মধ্যে একশ পেলেও, অনেকে ভেবেছিলেন, গণিতে সম্যক জ্ঞান না থাকায় তিনি উল্টো পাল্টা কাজ করে গেছেন। অথচ এন্ড্রুস বললেন, "হার্ডি বলেছেন, এত অদ্ভুত ধরণের না হলে রামানুজনের কাজ আরো মহত্তর হতো।....আর আমরা এখন তাঁর অদ্ভুত ধারণার মর্ম উপলব্ধি করে বিস্মিত হয়ে আছি।" অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বাক্সটার (R. S. Baxter) দেখলেন স্টেটিসটিকেল মেকানিক্সের হার্ড হেক্সাগন মডেলের সমাধানে রামানুজনের পদ্ধতি যুৎসই। আর বর্তমান পদার্থবিদ্যা জগতে ছাব্বিশ মাত্রার স্ট্রিং থিওরি (String Theory)-র সমাধানে যে গণিত খাটে তা হলো রামানুজনের নোটবইয়ে পাওয়া নাম্বার থিওরির একটি মডুলার ফর্ম। বিখ্যাত পদার্থবিদ ডাইসন সোজাসুজি বলেন, তাঁর অনেক কাজের ভিত্তিভূমিতে আছেন রামানুজন।—যে মানুষটি হার্ডির অনুপ্রেরণায় গণিতের ফলিত রূপ দেখতে চাইলেন না—হার্ডি পূর্বকালে সৃষ্টিকরা তার গণিত কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়।

হার্ডি-লিটলউড যে বক্তব্য একদিন তুলেছিলেন—শিক্ষিত রামানুজনের কাজ হতো অনেক ভালো—সেই ধারণায় সংশয় দেখা দেয়। এনড্রুস বললেন, "অনেক বেশি শিক্ষা পেলে রামানুজন

অনেক কাজ করতে পারতেন এই ধারণাটা রোমাঞ্চনার। তবে ইতিহাসের পটভূমিতে নামমাত্র যেসব প্রতিভার আবির্ভাব হয়, তাদের নিয়ে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং বলতে পারি, বেশি শিক্ষাতে রামানুজনের ক্ষতিই হতো।"

1947 সালে শিকাগোর বিখ্যাত নাম্বার থিওরি বিশারদ আন্দ্রে ভিল (Andre Weil) কার্ল ফ্রেদরিখ গাউসের কয়েকটি পুরনো সমাধান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। ভিল দেখেন ঐসব সমাধান বা ফর্মুলাকে অনেক সমস্যার সমাধানে লাগসই করে খাটানো যায়। এই পথে তিনি তৈরি করলেন ভিলের অনুমিতি (Veil Conjecture)। এলজাব্রিয় জ্যামিতির ক্ষেত্রে এই অনুমিতি দেখা গেল বেশ কাজের। 1974 সালে বেলজিয়ামের গণিতজ্ঞ পিয়ের ডেলিনে (Pierre Delegne) একেবারে হঠাৎ এই অনুমিতির প্রমাণ খুঁজে পেলেন। একবছর পর তিনি ও ইহারা (Ihara) রামানুজনের অনুমতির প্রমাণে ঐ প্রণালী খাটালেন, প্রমাণ করলেন। রামানুজনের ইনটুশনে পাওয়া অনুমিতির ব্যাখ্যায় গাউস স্বয়ং নেমে এলেন! নেহাৎ সাদাসিধে অনুমিতির প্রমাণে কত বিরাট ব্যাপক প্রচেষ্টার দরকার হলো! বার্নট খুঁজেপেতে সব প্রমাণ জোগাড় করে নোটবইয়ের ব্যাখ্যায় লিখে রাখলেন।

তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ রামানুজন কিনা—সেখানে সন্দেহ আছে। যদিও হার্ডি নিজের কালে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন। তাঁর কাজ বিশাল হলেও শ্রেষ্ঠ কিনা সে সন্দেহ থাকে। তাঁর অদ্ভুত পটভূমি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি মনকে স্পর্শ করে, তবু তাঁর সম্মানে এদের কোনো প্রভাব নেই। গরিব ছেলের রাজা হবার মতো রূপকথা তাঁকে নিয়ে লেখা যেতে পারে—তবে সে গল্প রূপকথাই হবে। বেঁচে যখন ছিলেন, তাঁর কাজের প্রভাব গণিতে পড়েছিল। যতদিন গেছে সেই প্রভাবের ধারা শুকিয়ে যায়নি, বরং ক্রমশ ফুলেফেঁপে উঠেছে। বিশেষ করে বার্নটের কাজের পর। নোটবই নিয়ে গবেষণা করে বার্নট মনে করেন, তিনি ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী নন, বরং নতুন পথে যাত্রী; সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর কাজের প্রমাণ হয়তো দেওয়া যায়—বলা যায় না তিনি কোন পথে কীভাবে সমস্যার সমাধান করেছেন। এযেন প্রস্তর যুগের মানুষের গড়া নানা মূর্তির বিচার। পরীক্ষা করে বলা যেতে পারে কীভাবে ঐ আকারটি গড়া

হয়েছে। বলা যায় না ঐ আকার কেন? আর ঐ আকার কীভাবে গড়া হয়েছে তার অনেক ধারণার সম্মিলিত রূপে রামানুজনের চিন্তার খেই ছোঁওয়া হয়তো যায়। বলা যায় না, ঠিক ঐ ভাবে রামানুজন তাঁর ফর্মুলাটি ভেবেছিলেন।

রামানুজনের ফর্মুলার প্রমাণ দিয়েও বার্নট সংশয় নিয়ে আছেন—ঐটি কি রামানুজনের ভাবা প্রমাণ?—এর উত্তর বার্নট জানেন না। তিনি বললেন নোটবইয়ের রামানুজন শুধু নেমেসিস নন, তিনি এসোটেরিক (Esoteric)—গণিতের নিজস্ব নির্বাচিত সামান্য কয়েক-জনের একজন শিক্ষার্থী! বার্নট এসোটেরিক শব্দের প্রচলিত অর্থ গূঢ়, রহস্য মূলক ধরলেন না। তিনি দর্শনে ব্যবহৃত অর্থ ধরলেন। —রামানুজন গণিতের শিক্ষার্থী—বিশিষ্টতম, একজন। এই শিক্ষার্থীটি —যাকে গণিত নিজে বেছে নিয়েছে—এখনো রোমাঞ্চনা জাগিয়ে চলেছেন। তবে গণিতে তাঁর অভিঘাতটি এখনো পূর্ণতা পায়নি। নোট বইয়ে বহু ফর্মুলা আছে, যার ব্যাখ্যা বার্নটরা দিলেও এখনো প্রকাশের মুখ দেখেনি। পলিয়ার মতো ভয়ে নোটবই থেকে পালিয়ে থাকেননি বার্নট। দশবছর পরিশ্রমের পর রামানুজনকে স্পর্শ করলেন বার্নট। 1929 সালে যে কাজের আরম্ভ সে কাজটি শেষ হলো 1987 সালে। উইলসন-ওয়াটসনের গবেষণার ধারাটি নেমে এলো বার্নট—এন্ড্রুসদের হাতে; কারণ হার্ডি জানেন এই নোটবই জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলবে; ভবিষ্যতের গণিত গবেষণার উৎস হয়ে থাকবে এই নোটবই।

বার্নট বললেন, নোটবই এর একটি পঙক্তির ব্যাখ্যা হাজার লাইনে দেওয়া যায়—এত সংক্ষিপ্ত তার রূপ। তাছাড়া নোটবইয়ে রামানুজন যে গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করেছেন সেটিও প্রচলিত নয়। তারা রামানুজনের নিজস্ব।—তবু সব নিয়েও রামানুজনের ফর্মুলা যেন বীজ। ফ্রীমান ডাইসন বলেন, এই বীজ রামানুজন গণিতের বাগানে পুঁতে গেছেন; এতদিনে সেগুলি ফুলফোটাতে শুরু করেছে। তবু সব বীজ থেকে চারা জন্মায়নি, সব চারা এখনো ফুলে ভরেনি। ডাইসন অপেক্ষা নিয়ে আছেন। রামানুজনের বীজের সব গাছের ফুলে ভরা বাগানের দৃশ্য এখনো কল্পনায় আছে ঠিকই। ডাইসন জানেন, সেই দৃশ্য বাস্তবেও ধরা দেবে। এখন শুধু তারই প্রতীক্ষা!

অধ্যায় আট

শতবর্ষের আলোকে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, "ভারতবর্ষের গণিত সম্পর্কে ভাবতে গেলে বর্তমানের এক আশ্চার্য মানুষের কথা স্বাভাবত মনে আসে। তিনি শ্রীনিবাস রামানুজন। দক্ষিণভারতের এক দরিদ্র নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, অবস্থার ফেরে সঠিক শিক্ষা পেলেন না, হলেন মাদ্রাজ পোর্টট্রাস্টের একজন কেরানি। অথচ সহজাত প্রতিভার অদম্য উচ্ছ্বাসে উদ্বোলিত হয়ে অবসর সময়ে সংখ্যারাশি আর সমীকরণ নিয়ে যেন খেলায় মেতে থাকতেন।...... পরে কেম্ব্রিজে গেলেন। সেখানে সামান্য কয়েক বছরে আশ্চর্য মৌলিক মহামূল্য গবেষণা করে এলেন। প্রচলিত রীতি না মেনে রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করলো।....মনে হয় প্রফেসর হাক্সলি তাঁকে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ বলে জানিয়ে গেছেন।"

এই শতাব্দীর চারের দশকে যখন ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া লেখা হলো তখন বিদেশে রামানুজনের গবেষণাপত্রের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, হার্ডির বিখ্যাত বারোটি বক্তৃতা অথবা নেভিলের বেতারভাষণ প্রচারিত, উইলসন-ওয়াটসনের নোটবই নিয়ে কাজের ইতিটানাও শেষ। রামানুজনের নোটবইকটি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির ভল্টে সুরক্ষিত এবং রামানুজনের পরিবার—যাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রামানুজন আমৃত্যু চিন্তা করে এলেন—তাঁরা যেমন আগে ছিলেন, তেমনি দারিদ্র্যবরণ করেই রইলেন। রামানুজন বিধবা স্ত্রী যবনিকার অন্তরালে থাকলেন।

1947 এ ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। দেশে ও বিদেশে রামানুজন গবেষণায় ভাঁটার টান দেখা দেয়। 1949-এ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় নোটবইকটির ফটোকপি তৈরি করলেন এবং বিজ্ঞানী ভাবার প্রচেষ্টায় 1957 সালে সেই নোটবইকটি আলোকের মুখ দেখে। রামানুজনের স্ত্রী তখনো যবনিকার অন্তরালে রইলেন।....সাতের দশকের শুরুতে

লস্ট নোটবই আবিষ্কৃত হলো। আর বার্নট শুরু করলেন নোটবই-কটির সম্পাদনার কাজ। ইতিমধ্যে কম্পুটার যুগের সূচনা হয়েছে। কম্পুটারের জন্য প্রোগ্রাম তৈরির রীতি নিয়ে গণিতবিদ-বিজ্ঞানীরা মাথা খাটাচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল রামানুজনের গণিত সেই সব প্রোগ্রামের পক্ষে উপযুক্ত ; আর রামানুজনের ফর্মুলা কম্পুটার সাহায্যে প্রমাণ করাও যায়। রামানুজন যেন কম্পুটার আবিষ্কার হবার পঞ্চাশ বছর আগে সেই যুগে আগেভাগে প্রবেশ করে গবেষণা করে গেছেন। এক বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে আটের দশকে নোটবইয়ের অনেক গণিতের প্রমাণ হাতে আসতে শুরু করে। রামানুজনকে নিয়ে গণিতসমাজে উথাল-পাতাল আলোড়ন জেগে ওঠে। 1987 সালে, রামানুজনের জন্ম শতাব্দীর কালে, সেই আলোড়ন তীব্র রূপ নেয়। যবনিকার অন্তরালে যে মানুষটি ছিলেন সেই জানকীর খোঁজ পড়ে। বার্নট স্বয়ং তাঁর সঙ্গে কথা বলে যান। মাদ্রাজে আন্তর্জতিক সম্মেলন শুরু হয়।...1987 সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দুজা ফাউণ্ডেসন শ্রীমতি জানকী আম্মলকে বিশহাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। তাছাড়া ঐ ফাউণ্ডেশন প্রতিমাসে একহাজার টাকার একটি বৃত্তি শ্রীমতি জানকীকে আজীবন প্রদান করতে প্রতিশ্রুত হয়। শ্রীমতি জানকীর বয়স তখন সাতাশি-আটাশি। উনিশ বছরে বিধবা হবার পর এই প্রথম আথিক সুখের মুখ দেখেন জানকী। তাঁর কাছে তখনো রাখা—রামানুজনের দেওয়া দুটি কলস, যে কলসে তিনি সামান্য কয়েক দিনের স্মৃতি আটকে রেখেছেন ! সামান্য, অথচ অসামান্য সেই স্মৃতি !

হিন্দুজা ফাউণ্ডেশন দুইজাতীয় স্কলারশিপের সূত্রপাত করলেন রামানুজনের নামে এই স্কলারশিপের পাঁচটি হবে স্নাতকোত্তর। কাজের জন্য আর অপর পাঁচটি হবে তরুন বিজ্ঞান প্রতিভার কাজের বিকাশে। ইনসাও (ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান একাদমি INSA) পিছিয়ে থাকেন না। রামানুজনের বিধবা স্ত্রী জানকীর জন্য এই প্রতিষ্ঠান থেকেও একহাজার টাকার একটি মাসিক বৃত্তি প্রদানের সূচনা হলো !—আটাশি বছরের শ্রীমতি জানকী যেন শতবর্ষের আলোকে আবার রামানুজনের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করলেন ! ভারতবর্ষও আবার রামানুজনকে আবিষ্কার করে। তবে তাঁর মৃত্যুর ষাটবছর পরে।

এই ষাটবছরের বিরতির পর গণিতবিদরা যেন রামানুজনের মনের স্পর্শ পেলেন। এক প্রজন্ম পরে রামানুজনের গবেষণার স্রোত বিজ্ঞান ও

গণিতের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। রামানুজনের গণিতের ফলিত রূপ দেখা দেয়! অন্যদিকে, কম্পুটারের সাহায্যে, স্পেশাল প্রোগ্রামের প্রয়োগে তাঁর ফর্মুলার ব্যাখ্যা বর্ণনা দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানে, মহাবিশ্বের সুপার স্ট্রিং থিওরির বিকাশে অথবা জটিল আনবিক প্রণালীর স্টেটিসটিকেল মেকানিক্সে রামানুজনের গণিতকে টেনে নেওয়া হলো। রামানুজনের জগৎ যেন ধীরে ধীরে গণিতের সমাজের চোখের সামনে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে। রামানুজনের জানানো ফর্মুলা সেই জগতে প্রমাণের হাত ধরে পুষ্পিত সুরভিত হয়ে ওঠে!—আর তখন গণিতবিদরা তিনটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বসেন।

রামানুজনের ভাবনার ভিত্তিতে কী ছিল? একি দৈবী শক্তি?.... রামানুজন ক্ষণজীবী ছিলেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র, বেঁচে থাকলে, আরো বিস্তৃত কি হতো? আস্কে বলেছেন, গণিতবিদ হিসেবে নয়, রামানুজনের বিশেষত্ব হলো মানুষের মন কী করতে পারে তাই তিনি জানালেন।—মানুষেরমন কী করতে পারে?....

তিনটি প্রশ্নের প্রথম ও তৃতীয়টির মধ্যে মিল আছে। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রশ্ন অন্যরূপে সেজে দাঁড়ায়—রামানুজন কি মিস্টিক, ধার্মিক?...মানুষ রামানুজনকে বুঝতে গেলে তাঁর গবেষণাকেও টেনে আনতে হয়। যেভাবে যে ভঙ্গীতে রামানুজন তাঁর ফর্মুলাগুলি নোটবইয়ে লিখে রেখে গেছেন—শুধু সমস্যা ও সমাধান—সেখানে তাঁর ভাবনার কোনো ইঙ্গিত নেই। তাঁর ফর্মুলার সবকটি বুঝতে দীর্ঘ ষাট-সত্তর বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে, রামানুজনের জীবনীকাররা তাঁকে মিস্টিক বলে বর্ণনা করে এলেন। হার্ভার্ডের ত্রিশতবার্ষিকী কনফারেন্সে, 1937 সালে হার্ডি যে বক্তৃতাটি দেন—'দ্য ইণ্ডিয়ান ম্যাথেমেটিসিয়ান—রামানুজন'—'ভারতীয় গণিতবিদ রামানুজন'—সেখানে তিনি তাঁর বিচারটি জানালেন—রামানুজন কি মিস্টিক?

হার্ডি-সেশু আয়ার-ওয়াটসনের সম্পাদিত রামানুজনের গবেষণা পত্রের সংকলনে সেশু আয়ারের লেখা জীবনীতে শ্রীআয়ার লিখে গেছেন, রাত্রে স্বপ্নে নামক্কলের দেবী তাঁকে ফর্মুলার উত্তর জানিয়ে যেতেন বলে

রামানুজন বলেছেন। তারপর ঘুম ভেঙে উঠে ঘুমচোখে সেই উত্তর লিখে রাখতেন তিনি ; পরে ফলাফল দ্রুত মিলিয়ে দেখতেন।....হার্ডি এই স্বপ্নে দৈবীফল পাবার ঘটনাটির উল্লেখ করলেন তাঁর বক্তৃতায়। হার্ডি স্বয়ং নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন ! যুক্তিগ্রাহ্য গণিত তাঁর পেশা এবং নেশা হলো ক্রিকেট খেলা দেখা। অতএব রামনুজনের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে স্বপ্ন, দৈবী প্রেরণা ইত্যাদি বিষয়কে ইম্পর্টেন্স দেন না। তিনি বললেন,

"রামানুজন যে মিস্টিক ছিলেন এই ধারণায় আমার বিশ্বাস নেই। সাদামাটা পার্থিব ধ্যানধারণা ছাড়া তাঁর জীবনে ধর্মের কোনো প্রভাব দেখিনি ! গোঁড়া পরিবারের উচুঁজাতের হিন্দু ছিলেন তিনি ; আর বিদেশে যে সব ভারতীয়রা ছিলেন, তাদের সকলের চেয়ে কড়াকড়ি করে জাতপাতের রীতিনীতি কট্টর ভঙ্গীতে মেনে এসেছিলেন—কারণ বাবা মাকে মানবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে এলেন। কট্টর নিরামিষাসী ছিলেন। যতদিন কেম্ব্রিজে ছিলেন নিজের হাতে রান্না করলেন, তাও আবার রান্নার আগে পায়জামা পরে নিতেন !

গবেষণা সংকলনে যে দুটি স্মৃতি কথা লেখা আছে, তা যে দুজনের—তাঁরা রামানুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন ; অবশ্য দুজনের দেখার রীতি আলাদা। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে এই দুটি লেখা পরস্পর বিরোধী। সেশু আয়ার আর রামচন্দ্র রাও যথাক্রমে লিখলেন,

—'রামানুজনের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ছিল। নামক্কলের দেবীর প্রতি তাঁর ছিল সবিশেষ ভক্তি।....পরমব্রহ্মে তাঁর ছিল বিশ্বাস ; মানতেন মানুষ ভাগবত শক্তি অর্জন করতে পারে। জীবন আর পরাজীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিদিষ্ট প্রত্যয় বা ধারণা ছিল।'

—'তাঁর ধর্ম হলো আচারমাত্রিক, এখানে বোধিমননের প্রতীতি নেই। মনে আছে একদিন আমাকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, সব ধর্মই মোটামুটি এক, একই সত্যের পথিক।'

"....কোন মতটা ঠিক ? আমি নিঃসন্দেহে জানি ; নিশ্চিত ভাবে আমি তা জানি।"

হার্ডি মনে করেন, একজন তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মবেত্তা, যেমন কেন্টারবেরির আর্চবিশপ, যদি বলেন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী—তবে

অবাক হবার কিছু নেই। তিনি যদি অন্য কাউকে কদাপি বলেন, ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস রাখেন না—তবে সেই বক্তব্যের সত্যতা মানতে হয়, নইলে কেন তিনি অমন কথা বললেন? "তেমনি গোঁড়াব্রাহ্মণ রামানুজন যদি আমাকে বলেন, তাঁর নির্দ্দিষ্ট কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, তবে বাজি রেখে বলতে পারি, তিনি সত্যি বলছেন।"

রামানূজনের ধর্মবিশ্বাস যে কী—সেটা জানা খুব একটা জরুরি ব্যাপারে নয়। শৈশবে যে আবহাওয়ায় তিনি মানুষ, সংস্কৃত শ্লোক চর্চা, পূজা উপাসনা, রামায়ণ মহাভারতের গল্প পাঠ, ইত্যাদি—আচার আচরণে, নিভৃত চিন্তায়, তার চিহ্ন যে থাকে সেখানে মতদ্বৈধ নেই! আবার দীর্ঘ চার পাঁচ বছর হার্ডির সংস্পর্শে এসে যেমন তিনি ফলিত গণিতকে, যুদ্ধকে অপছন্দ করতে শুরু করলেন, তেমনি মুক্ত চিন্তার দ্বারেও এসেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পষ্ট নয়। অথচ বাবা, বিশেষ করে মাকে, কথা দিয়েছিলেন বলে তিনি ইংলণ্ডের মতো ঠাণ্ডা জায়গাতে স্বপাকে নিরামিষ খেলেন, আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট আচার আচরণ অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মেনে এলেন। তাছাড়া, ইংলণ্ডে যখন ছিলেন, সেখানে তাঁর আচার আচরণে, কথাবার্তায়, চিন্তা ধারণায় কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা যে ধরা পড়েনি, তা হার্ডি বললেন। রামানুজনকে প্রাচ্যের অজানা রহস্যের প্রতীক বলে মেনে নিতে হার্ডির আপত্তি। তিনি জানেন গণিতের সমস্যার সামনে যে কোনো গণিতজ্ঞ একাগ্র হয়ে দাঁড়ালে সঠিক সমাধান বহুবার বহু গণিতজ্ঞের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। গণিতজ্ঞ সমাধান মনশ্চোখে যেন দেখেছেন, তারপর প্রমাণে নামেন। যেমন বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের দুটি চরণ সহসা ভেসে ওঠা। এই ভেসে ওঠাটি কোনো গণিতজ্ঞের মনে দ্রুত জাগে; কারো মনে জাগে ধীরে ধীরে। রামানুজনের বেলা এটি দ্রুত নয়, দ্রুততর লয়ে ভেসে উঠেছে। আর তিনি দুহাতে সেই ভাসন্ত সমাধানটি তুলে নোট বইয়ে লিখে রেখেছেন। প্রমাণের চেষ্টা করেননি। অবোধ্য যদি কিছু থাকে তা হলো তাঁর প্রমাণ নিয়ে ভাবনার অনিচ্ছা।

আবার 1987 সালে বার্নটকে জানকী দেবী বললেন,—অঙ্কের আকর্ষণে দিবারাত্র মগ্ন থাকতেন বলে মন্দিরে যেতে কোনোদিন সময় পাননি।—না, নামাক্কলের মন্দিরেও ফিরে এসে তাঁর যাওয়া হয়নি। দৈবী প্রত্যাদেশের কথা যদি বলেছেন, তবে বার্নট মনে করেন, তাঁর

এই দ্রুত সমাধানে আসার ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করার অস্বস্তি এড়াতে নিতান্ত সহজ কথাটি বলেছেন তিনি। কারণ হার্ডি জানেন, "অন্তরের গভীরে সব গণিতজ্ঞ একই রীতিতে ভেবে থাকেন ; রামানুজন ব্যতিক্রম নন।....তবে সাধারণ ধারণার শক্তি, আকারের সুস্পষ্ট ধারণা, নিজের করা সমাধানের দ্রুত পরিমার্জনের ক্ষমতা—এসব মিলিয়ে তিনি যেন বিস্ময়ের!" রামানুজনের মূল্য স্থির করতে হার্ডি যে স্কেলের কথা বলেছিলেন, সেই স্কেলটিকে অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, যে তিনটি ক্ষমতার মিশ্রনে রামানুজন বিশিষ্ট—সেটি নিয়ে বিচার করলে রামানুজন একশতে একশ পেলে অন্য সব গণিতজ্ঞ তিরিশের বেশি পেতে পারেন না। সমাধান ভাবা এবং আবার তার দ্রুত পরিমার্জনার যে ক্ষমতা—সেখানে তাঁকে চ্যালেঞ্জ একমাত্র কম্পুটার করতে পারে। ···গোসপার ঠিক একই করণে, কম্পুটার ঠেকিয়ে রামানুজনকে অবাক করা কাজের জগৎ থেকে সরাতে চাইলেন।—অন্য যন্ত্র থেকে কম্পুটার অন্য জাতের, কারণ এটি দেহের পরিশ্রম লাঘব করে না, করে মনের শ্রম লাঘব। রামানুজনের অসাধারণ সচল সজীব মন নিজেই যেন এক কম্পুটার। তেমনি দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। শুধু প্রোগ্রাম যে তৈরি করে সেই মানুষ—সেও আরেকটি কম্পুটার। এক রামানুজন যেন দুটি কম্পুটার। দ্রুত প্রোগ্রাম তৈরি করছেন, দ্রুত অঙ্ক কষছেন। আস্কে যখন বলেন রামানুজনের কাছ থেকে জানা যায়, মানুষের মন কী করতে পারে—তখন জানা যায়—মানুষের মন চেনাজানা কম্পুটার থেকেও দ্রুত কাজ করতে সক্ষম।—তবে সব মানুষের নয়। দুর্লভ মূল্যহীন মানুষরাই সক্ষম!····

ডঃ জি (Dr A Zee), তাঁর ফিয়ারফুল সিমেট্রি (Fearful Symmetry) বইটিতে একটি সীমানার কথা বললেন। "পদার্থ-বিজ্ঞানীরা ভারি সাবধানী, তাঁরা বলেন প্রাকৃতিক জগতের সীমাতেই তাঁদের জ্ঞান। অথচ এই জগৎ প্রাকৃতিক(physical) এবং (অন্য কোনো টার্ম হাতের কাছে না থাকায়) অ-প্রাকৃতিক (nonphysical) অংশে যে ভাগ করা—সেই ধারণা থেকে চিন্তাজগতের ইতিহাসে নতুন বাঁকের শুরু, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা সে পথ দিয়েই বইলো। তবু ঐ বিভাজন রেখা একদিন পার হতে হবে।"—সেই বিভাজন রেখাটি হলো বোধি ও মননের (Intellet ও Consciousness) বিভাগের অংশে।—বিজ্ঞান যতদিন না ঐ বিভাজন রেখাটি পার হয়ে

মননের শক্তিকে পদার্থবিদ্যার জগতে আনতে পারছে, ততদিন রামানুজনকে বিচার করা বোধ করি অসম্ভব। শুধু আস্কের বক্তব্যের প্রতিধ্বনী তুলে বলা যাবে মানুষের মন কী যে করতে পারে!

রামানুজনের শতবার্ষিকীর সেমিনার গুলিতে স্বাভাবিকভাবে টি এস এলিয়েটের কথা উঠেছে। কারণ 1888 সালের ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। রামানুজনের চেয়ে ন মাসের ছোট তিনি। তাঁর শতাব্দীকালও পিঠাপিঠি দেখা দেয়। সেমিনারগুলিতে এলিয়টের সমাধি ফলকে যা উৎকীর্ণ সেই পঙক্তিটি রামানুজন সম্পর্কে বারবার উচ্চারিত হয়েছে—In my beginning is my end. আমার শুরুতেই আমার শেষ। দুটি বিষয় জানাতে কথাটি বলা হয়েছে ক্ষণজীবী রামানুজন যেদিন ফুটে উঠতে শুরু করলেন, সেদিনই তাঁর মৃত্যু যেন হলো। আর নোটবইয়ে যে সমস্যা-সমাধানের শুরু, সেই সমস্যা-সমাধানটি জানা যেন সব জানার শেষ!....কী করে রামানুজন ভাবলেন?

তবু রামানুজনের অকাল মৃত্যুর জন্য হার্ডি বিচলিত ব্যথিত তত নন। রামানুজনকে রামানুজন হিসেবে পছন্দ করেও তিনি ভাবেন, "কুম্ভকোনমের কলেজ যেদিন সে মানুষটিকে গ্রহণ করলো না—সেই অসাধারণ মানুষটি যাকে একবারই তারা পেয়েছিল—সেদিনের সেই ক্ষতির উপশম নেই। একটি অপটু অনমনীয় শিক্ষাব্যবস্থার ফলে কী যে ক্ষতি হতে পারে আমার জানা সেই অপকৃষ্ট উদাহরণ হলো এইটি। প্রতি বছরে যেন ষাট বছরের ক্ষতি—তেমনি পাঁচ পাঁচটি বছর!"

ইংলণ্ডে যে পাঁচটি বছর রামানুজন ছিলেন, সেদিনের তুলনা করে রামানুজনের আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের দিনগুলিকে হার্ডি ভাবেন—সেগুলো শুধু ক্ষতি। অথচ আধুনিক গণিতবিদরা বলেন, সেই দিনগুলিতে যে দান তিনি গণিতের ঝুলিতে দিয়েছেন তা বিস্ময়ের। হার্ডি আবেলের কথা তুলে বললেন, তিনি ছাব্বিশ বছরে যে শিখরে পেঁৗছেছিলেন তাঁর উপরে উঠতে তিনি পারতেন না।—একথা কি রামানুজন সম্পর্কে প্রযোজ্য? আবেলকে নিয়ে আলোচনা ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পাঁচুই আগস্ট 1802 সালে নরওয়ের ফিন্নোই দ্বীপে জন্ম হলো নিয়েল হেনরিক আবেলের (Niels Henrik Abel)। তের বছর বয়সে অসলোর ক্যাথিড্রেল স্কুলে

ভর্তি হলেন। সেখানে তিনি মাঝারি মাপের ছাত্র। তারপর একদা স্কুলে এক নতুন শিক্ষক এলেন, হোমবো (B. M. Holmboe)। তিনি আবেলের সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করলেন—গণিতের জগতে তাঁরই হাত ধরে কিশোর আবেল এলেন। 1820 সালে তাঁর বাবার মৃত্যু ঘটে। বিধবা মা আর পাঁচটি সন্তান প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় পেছনে পড়ে থাকেন। ততদিনে আবেলের প্রতিভার ইঙ্গিত পেয়ে শিক্ষাবিভাগ তাঁর প্রতিভার বিকাশে এগিয়ে এসেছে। আবেল স্কলারশিপ পেলেন, অধ্যাপকরাও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। 1821 সালে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন তিনি! এই সময় থেকেই তাঁর মৌলিক কাজের শুরু। বয়স তখন তাঁর উনিশ। আবেলের প্রথম যে কাজ—তা টাইমের গাণিতিক সমস্যা নিয়ে। প্রায় তিন বছর সমস্যাটি নিয়ে ভাবলেন। একবার মনে হলো, তিনি সঠিক উত্তর পেয়েছেন। পরে দেখেন তাঁর সমাধান ভুলে ভরা। আবার প্রথম থেকে সমস্যাটি আক্রমণ করে শেষমেশ সমাধান পেলেন। 1824 সালে একটি ছোট পত্রিকাকারে গবেষণাটি প্রকাশ করলেন। তবে টাইম নিয়ে আবেলের গাণিতিক ভাবনাটি সেই সময়ে অবজ্ঞাত হয়ে রইলো। 1825 সালে সরকারি বৃত্তি পেয়ে আবেল বার্লিনে এলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক ক্রেলের (A. L. Crelle) সাক্ষাৎ ঘটে। ক্রেল জার্মান-ভাষায় গণিতের জার্নাল প্রকাশের কথা সেদিন ভাবছেন। এই পত্রিকাটি প্রকাশ হলে আবেলের বহু গবেষণাপত্র সেখানে প্রকাশিত হলো। প্রতিটি গবেষণার গভীরত্ব আর নতুনত্ব দেখে গণিত সমাজ মুগ্ধ। বার্লিন থেকে আবেল এলেন প্যারিসে—সেখানেই তিনি ইনটিগ্রালের উপর বিখ্যাত উপপাদ্যটি পেলেন। তবে অধ্যাপক কোচি (A. L Cauchy) সেই উপপাদ্যটি পছন্দ না করায় আবেলের মৃত্যুর আগে উপপাদ্যটি প্রকাশের মুখ দেখে না। 1827 সালে আবেল অসলো ফিরে এলেন। নিঃস্ব, যক্ষারোগি একজন। তবুও সেই অসুস্থ মানুষটি ইলিপটিকেল ফাংশন, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনের উপর আশ্চর্য গবেষণাপত্র লিখে এলেন। তাঁর একটি কাজের সঙ্গে জেকবির কাজের মিল। এ সময়ে আবেল অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বদলি অধ্যাপকত্বের কাজ পেয়ে কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখলেন। তবে কপালে সুখ সয়না। 1828 সালে ফুসফুসে রক্তপাত ঘটে। কিছুদিন পর 1829 সালের ছয়ই এপ্রিল ছাব্বিশ বছর আট মাস বয়সে মারা যান।

অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সন্তান আবেল। বাবা ছিলেন গ্রামের পাদরি। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এলেন। যে কাজগুলো পরবর্তীকালে অসাধারণ বলে মনে হয়েছে—সেই দুটি কাজই জীবনকালে অবজ্ঞাত থাকে। বিদেশ থেকে ফিরে এলেন যক্ষারোগ নিয়ে। মারা যান দেশে—দেড় বছর পর। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁরই জানানো একটি গ্রুপ নিয়ে পদার্থবিদরা কণাগজতের রহস্য বুঝতে এলেন। য়াং ও মিলস (Yang & Mitls) এর হাত থেকে পাওয়া যায় নন আবেলিয় গেজ থিওরি—আবেলকে এখানেও যেন না মেনে তত্ত্ব গড়ে তোলা হলো। তবে ইলেক্ট্রো মেগনেটিজম হলো আবেলিয় গেজ থিওরির উদাহরণ।

রামানুজনের সঙ্গে আবেলের মিল আছে, সন্দেহ নেই। অন্তত হার্ডির চোখে তা ধরা পড়েছিল। দরিদ্রের সন্তান, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ, স্বদেশে অধ্যাপকদের পৃষ্ঠপোষকতা, বিদেশে অসাধারণ কাজ, সমসাময়িক নিরিখে কাজের মূল্যটি না বোঝা এবং অল্পবয়সে যক্ষায় মৃত্যু—অনেক মিল। তবু যে গণিতবিদটি অয়লার-জেকবির মতো বহু ফলপ্রসূ তাঁর সঙ্গে আবেলের তুলনা টানা যায় না। তাছাড়া আবেলের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি ঘটেছে বিদেশে। রামানুজনের নোটবই হলো দেশের ফসল। মৃত্যুর দ্বার দেশে এসে আবেল যে কাজ করেছেন তা চমৎকৃত করে ঠিকই। তবে রামানুজনের মক থিটা ফাংশন—সে যে মহাগণিতজ্ঞের শ্রেষ্ঠ কাজের তুলনা! আবেল যদি একটি সমুচ্চ শিখর হন—রামানুজন সেখানে বহু উচ্চ শিখরে গড়া হিমালয়।—আধুনিক গণিতবিদরা ভাবেন, আরো বাঁচলে রামানুজন নিশ্চয় অন্য অসাধারণ কাজ করতে পারতেন। রামানুজন হাউই বা উল্কা নন।—তাছাড়া আবেলের জন্য রক্তমাংসের মানুষ হোমবো ছিলেন। রামানুজনের জন্য ছিল একটি ছাপানো বই—কারের বই।—তুলনার চেয়ে প্রতিতুলনা এখানে বেশি!

রামানুজনের শেষ 'জীবনের কাজ—যা লস্ট নোটবুকে লিপিবদ্ধ সেখানে এনড্রুস ছশ'র কাছাকাছি গণিতের অভিজ্ঞান (identity) পেলেন। সেখানে রজার-রামানুজনের আদলে পাওয়া কন্টিনিউড ফ্র্যাকসন যেমন আছে তেমনি আছে q-সিরিজ, এবং ফলস ও মক থিটা ফাংশন, মডুলার ইকুয়েশন ইত্যাদি। অর্থাৎ শেষ জীবনেও নানা ফসলে গোলা ভরিয়ে এলেন।—আধুনিক গণিতবিদরা অয়লার ও

জেকবির সঙ্গে রামানুজনের আরো একবার তুলনা করলেন। এলজেব্রিয় ফর্মুলা গঠনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, ইনফাইনাইট সিরিজে ট্রান্সফর্মেশনের আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে অয়লার ও জেকবির দক্ষতার তুলনা করা যায়। কিন্তু হাইপার জিওমেট্রিক সিরিজ অথবা থিটা ফাংশনের পথ কেটে রামানুজন এই দুজনকে ছাড়িয়ে এলেন। তাছাড়া তিনি রিমানকে পেয়ে রিমানকে ছাড়িয়ে গেলেন, রজারকে পেয়ে তাঁকেও ছাপিয়ে চলে যেতে পারেন। পার্টিশন নাম্বারে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নিশ্চয় হার্ডির সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। তবু 1919-20 সালে যখন চরম অসুস্থ তিনি, তখন পার্টিশনের যে কাজ করলেন সে কাজের তুলনা নেই জেকবি অয়লার আবেলের ফসল ফলানো ক্ষেতের সঙ্গে !

তিনি 1919 সালে দেখালেন যে কোনো ইনটিজার kএর সাপেক্ষে $p(5k+4)$ পাঁচ দিয়ে বিভাজ্য। তেমনি $p(7k+5)$ ভাগ করা যাবে সাত দিয়ে। ধরা যাক $k=2$, তাহলে $5k+4$ হবে 14 এবং $7k+5=19$; এবং $p(14)=135$—যা পাঁচ দিয়ে বিভাজ্য এবং $p(19)=490$—যাকে সাত দিয়ে ভাগ করা চলে।

1920 সালে একই ধরণের ফলাফল জানালেন। $p(11k+6)$ কে 11 দিয়ে ভাগ করা যাবে, $p(25k+24)$ হবে 25 দিয়ে বিভাজ্য। এবং $p(49k+19)$, $p(49k+33)$, $p(\pm 9+40)$ এবং $p(49k+47)$ সবকটি 49 দিয়ে বিভাজ্য। তাছাড়া $p(121k+116)$ ভাগ করা যাবে 121 দিয়ে। মজা হলো $25=5^2$, $49=7^2$, এবং $121=11^2$। এই থেকে রামানুজন একটি অনুমিতি জানালেন :— $5^a7^b11^c$, যেখানে এধরণের বিভাজক পাওয়া যায়। এই ফর্মুলাটি পরে আরো অনেক সধারণ ও বিস্তৃত করে পাওয়া গেল $5^a7^{(b+1)/2}11^c$ —যেটি রামানুজনের কাজের আধুনিক গণিতবিদদের হাতে বিস্তৃতিমাত্র এবং $b+1$ এর $+1$টি রামানুজনের ভাবনা।

রামানুজনের দ্বিতীয় নোটবইয়ের পঞ্চমঅধ্যায়ের 29 সংখ্যক অভিজ্ঞানটি লিখে কেটে গেছেন তিনি। কারণ সেখানে যে বক্তব্যটি জানালেন তা n এর মান 1 থেকে 99,999, 999 পর্যন্ত শুদ্ধ। কিন্তু n এর মান 10^8 হলে খাটেনা। অর্থাৎ একটি গণিত তৈরি করে, তার সীমাটিও যেন চোখের সামনে দেখলেন এবং তাকে নাকচ করতে দ্বিধা নেই তাঁর। অথচ এই নাকচ করা অভিজ্ঞানটি থেকে বিখ্যাত রামানুজনের যমজের (Pair) সৃষ্টি। তাঁর নাকচ করা গবেষণাও কত ফলপ্রসূ।

রামানুজনের আরেকটি আশ্চর্য কাজ হলো π এর মান নির্দেশ করতে তাঁর ফর্মুলা যেটি 1914 সালে তিনি ভারতবর্ষে লিখে গেছেন।

$$\frac{1}{\pi}=\frac{\sqrt{8}}{9801}\sum_{n=c}^{\infty}\frac{(4n)![1103+26390n]}{(n!)^{4}\,396^{4n}},$$

যেখানে $n!=n\times(n-1)(n-2)....\times I$ এবং $o!=1$.

1985 সালে গোসপার রামানুজনের সিরিজ নিয়ে π এর মান জানতে কম্পুটার ব্যবহার করলেন। 17 মিলিয়ন সংখ্যা পর্যন্ত পেলেন যে সংখ্যা তা, অন্য এক পদ্ধতিতে কষা π এর মানের সঙ্গে মিল টানে। কাজেই রামানুজনের ফর্মুলার 1103 রাশিটি শুদ্ধ। কতশুদ্ধ ?—গোসপার বললেন $10^{10000000}$ ভাগে ভুলের পরিমাণ হতে পারে এক ! 1103 এর জায়গায় অন্য কোনো রাশির কথা ভাবলে অঙ্কের উত্তরে ভুল দেখা যায়। এ জাতীয় এলগোরিথম যা কম্পুটারের সাহায্যে পাওয়া যায়, তা রামানুজন অনুমানে জানলেন ! সাধে গোসপার বললেন, তিনি নেমেসিস, ভালবাসার অযোগ্য !

আধুনিক গণিতবিদরা দেখেন গাউসের গণিত ব্যবহার করে অনেক জায়গায় রামানুজনের জানানো অভিজ্ঞানের প্রমাণ দেওয়া যায়। রামানুজনের জানানো π এর মানের প্রমাণ হলো অধ্যাপক কানাডার (Kanada) জানানো গাউস-ব্রেণ্ট-সালামিন (Gauss-Brent-Salamin) এর ফর্মুলার সাহায্যে জানানো মানের সঙ্গে তুলনা করে। অতএব গাউসের সঙ্গে রামানুজনের তুলনা করার ইচ্ছে জাগে।

যে তিনজন বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞের কথা ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারে তাঁরা হলেন আর্কিমেদেস, নিউটন এবং কার্ল ফ্রেদরিখ গাউস। গাউসের জন্ম 1777 সালের তিরিশে এপ্রিল জার্মানির ব্রুনসউইক গ্রামে। ছোট বেলা থেকে পাকা, জ্যাঠা ছেলে। তিন বছরে বাবার হিসেবে ভুল ধরলেন। দশ বছর বয়সে ক্লাসে এক থেকে একশ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ মুখেমুখে করলেন। কাজেই এই দরিদ্র পিতামাতার সন্তানটিকে ব্রুনসউইকের ডিউক আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। আমৃত্যু 1816 সাল পর্যন্ত তাঁর সাহায্যের বদান্য হাতটি বাড়িয়ে এলেন ডিউক। 1795 সালে বিখ্যাত গোটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন গাউস। এখানে ভাষাতত্ত্ব বা গণিত কোনটা যে পড়বেন সে নিয়ে তাঁর দ্বিধা। যা হোক একবছর বাদে গণিতকে বেছে নিলেন তিনি।

1799 সালে হেমস্টেড্ট্ (Helmstedt) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর বিনা উপস্থিতিতে তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হলো গণিতে। 1814 সাল থেকে গাউস একটি ডায়রি রাখতে শুরু করলেন। এখানে তিনি গণিতের চিন্তা, ভাবনা, প্রকরণ, অভিজ্ঞান লিখে রাখতেন। এর প্রথম অভিজ্ঞানটি হলো কম্পাস আর স্ট্রেট এজ দিয়ে কি করে সতের ভূজের পলিগন আঁকা যাবে। এটি তিনি 1796 সালে আবিষ্কার করলেন। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বইটি প্রকাশিত হলো—Disquisitiones Arithmeticae; তাঁর ধারণা, গণিত হলো বিজ্ঞান জগতের রানী এবং এরিথমেটিক হলো গণিতের সাম্রাজ্ঞী। এই এলজাব্রিয় এরিথমেটিকের শাখা নাম্বার থিওরির বিকাশ ঘটলো প্রথম বইটিতে! এরপর তিনি মাত্র 155টি গবেষণাপত্র সারাজীবনে প্রকাশ করে এলেন। কারণ তিনি দুটি মতে বিশ্বাসী ছিলেন—Pauca, sed matura (অল্প কিন্তু পরিপক্ক) এবং ut nihil amplius desiderandum relictum sit (আর কিছু করার নেই)। বড় খুঁতখুঁতে ছিলেন। কাজটি পছন্দ না হলে, পরিপূর্ণ না হলে প্রকাশ করতে চাইতেন না। সেইজন্য নিজের অনেক কাজ প্রকাশ না করে লুকিয়ে রাখলেন।

1820 সালে ধরাকৃতি বা জিয়ডেসি (Geodesy) নিয়ে ভাবলেন। তাঁর ভাবনাটি নিয়ে বের্নহার্ড রীমন তাঁর জ্যামিতি সৃষ্টি করে 1854 সালে গোটেনগেনে জানালেন। বৃদ্ধ গাউস উত্তেজিত হয়ে শোনেন তাঁর কাজটি রীমানের হাতে পূর্ণরূপ পেয়েছে ;—তিনি সেকাজে কেন আর লাগেন নি ? ইউক্লিডের জ্যামিতিকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি নন-ইউক্লিয়ড জ্যামিতির দ্বারে এলেন। তবে ভয় পেয়ে আশংকাতে লুকিয়ে রাখলেন তাঁর কাজ। 1830 সালে বোলাই ও লোবাচেওস্কির কাজ প্রকাশ হলে গাউস বললেন, ঐ কাজ তিরিশ বছর আগে তিনি করেছিলেন। প্রকাশ করেন নি।—নন ইউক্লিডিয় জ্যামিতির ভাবনার অগ্রদূত তিনি। অথচ এখানেও তিনি নামহারা।

1811 সালে যে গণিত তিনি ভাবলেন, সেটিও নিজের কাছে রাখলেন বলে কোচির ইনটিগ্রাল থিওরেম নামে তা পরে প্রচলিত হলো। কোচি হলেন সেই থিওরেমের পুনরাবিষ্কর্তা। তেমনি একমুখী গণিতের (non commutative algebra) আবিষ্কারের সম্মান জোটে, তাঁর নয়,—হ্যামিলটন (W. Hamilton) এবং গ্রাসমানের (Hermann Grassmann)!

ইলিপটিকেল ফাংশনের আবিষ্কর্তা তিনি। 1812 সালে তিনি এর মূলটি আবিষ্কার করলেন। অথচ প্রকাশ করলেন না বলে 1827-29 সালে জেকবি ও আবেল পুনরাবিষ্কার করে আবিষ্কর্তার সম্মান পেলেন। তবে 1812 সালে হাইপার জিওমেট্রিক সিরিজটি আবিষ্কার করে প্রকাশ করলেন তিনি। 1833 সালে গাউস ও ওয়েবার (Weber) টেলিগ্রামের দ্বারে এলেন। দু-একটি পেপার প্রকাশও করেন। তবে এই যন্ত্র নিয়ে কোনো প্রচারে নামলেন না। মর্সের (Morse) যন্ত্র আবিষ্কার হবার পরের বছর 1845 সালে বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে গাউসদের যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এই যন্ত্রের সংবাদ জেনে 1854 সালে সার ডেভিড ব্রুস্টার গাউসকে চিঠি লেখেন। গাউস উত্তর পাঠান যা মৃত্যুর আগে লেখা তাঁর শেষ চিঠি। এবং তেইশে ফেব্রুয়ারি 1855 সালে মারা যাবার আগে জানলেন ডায়রির পাতায় লুকিয়ে রাখায় আরো একটি কাজের আবিষ্কর্তার নাম থেকে বঞ্চিত হলেন!

এই গাউসের সঙ্গে রামানুজনের তুলনা করা য়ায়? গাউসের কাজ তাঁরই সময়ে অন্য গণিতজ্ঞরা পুনরাবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সময়ের তফাৎ হয়তো খুব বেশি হলে তিরিশ বছর। আর রামানুজন অন্যের কাজ পুনরাবিষ্কার করে সেইসব কাজ ছাপিয়ে গেলেন; লিখে রাখলেন নোটবইয়ে। সে সব কাজের পুনরাবিষ্কার ঘটেছে কদাচ। যদিও বা ঘটে, তার চিহ্ন পাওয়া যায় অন্তত পঞ্চাশ বছর পর। গাউস তাঁর ডায়ারি নিজের কাছে রেখেছিলেন। কাউকে দেখাতে চান নি। আর রামানুজন—নোটবইকটি তাঁর কাজের সার্টিফিকেট বলে সকলকে দেখিয়ে এলেন। সেই নোটবই দেখে সেকালে কেউ কিছু বোঝেনি—এত বেশি এগিয়ে থেকে চিন্তা করে গেলেন তিনি। গাউস বিজ্ঞানের শাখায় তড়িৎচুম্বক বিভাগে অসাধারণ কাজ করলেন। গণিতের ফলিত রূপের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষাও রইলো। রামানুজন ফলিত দিকে দৃষ্টি দিলেন না। তাঁর গণিতের ফলিত রূপ পাওয়া গেল মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর!⋯না, রামানুজনের সঙ্গে গাউসের তুলনা চলে না। অয়লার-জেকবি-আবেল-গাউস, এঁদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। তিনি এঁদেরই একজন; অন্যতম, বিশিষ্টতম।

আবেল মারা যান ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সে, জেকবি সাতচল্লিশে, অন্যদিকে অয়লার দীর্ঘজীবী; 76 বছর বয়সে মারা যান; এবং গাউস

বাঁচেন পঁচাত্তর বছর। অন্ধ অয়লার জীবনের শেয়দিন পর্যন্ত গণিত নিয়ে ভেবে গেছেন ; পঞ্চাশ বছর বয়সে গাউস তড়িৎচুম্বক বিভাগে মৌলিক কাজ করছেন। এবং সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৃষ্টিশীল। কাজেই রামানুজন দীর্ঘজীবী হলে আরো শোভাময় হতে পারতেন না, একথা বলা চলে না। ভাষা সাহিত্যে বয়স বাধা হয় না। ভাষা গণিতেও তো হয় না! সমকালীন টি এস এলিয়ট মারা যান 77 বছর বয়সে। পঞ্চাশ পার হয়েও তিনি রচনা করেছেন অসাধারণ কাব্য গ্রন্থ। আধুনিক গণিতবিদরা ভাবেন, রামানুজন ভাষাবিদ। ভাষাগণিতের সাহিত্যিক—শিল্পী ও স্রষ্টা। তিনি পঞ্চাশেও যে সজীব সৃষ্টিশীল থাকতেন—সে সম্ভাবনাটি নাকচ করা যায় না।—হার্ডির বিচার হয়তো ঠিক নয়।

নোটবইকটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় না—প্রথাসিদ্ধ পথে হাঁটলে রামানুজন অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য কাজের হদিশ দিতে পারতেন। বলা যায়, ভালো লাইব্রেরি পেলে তিনি বিদেশে যা করেছেন, দেশেও তা করতে পারতেন। অবশ্য যদি করার সুযোগ পেতেন।—এই সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আবেল-গাউস-অয়লার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। সৌভাগ্য আমাদের, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; যদিও আবেলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যখন জোটে তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। 1913 সালে রামানুজন যখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পান তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। তার আগে কলেজের অধ্যাপক, সরকারী আমলারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য, সেদিন মাদ্রাজে গণিত জানা বেশ কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আয়ার প্রাহ্মণ, শৈব ; অথবা অন্ধ্রের ব্রাহ্মণ—এঁরাও শৈব। রামানুজন আয়েঙ্গার, বৈষ্ণব। শৈব বৈষ্ণবদের চিরন্তন বিবাদটি এক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। একটি বৈষ্ণব মনীষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক শৈবের হাত এগিয়ে এসেছিল—কারণ গণিত হলো একটি নিরপেক্ষ উদাসীন সর্বজনীন ভাষা। তবু প্রশ্ন থাকে, সেদিন দক্ষিণভারতে যা ঘটেছিল, তা উত্তর বা পূর্বভারতে কি ঘটতে পারতো? রামানুজন বাংলার মফস্বল শহরের মানুষ হলে তাঁর বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা কতটা? সেই সময়ে মাদ্রাজে যা ঘটেছিল, অন্য সময়েও কি তা ঘটতে পারে? পারতো?

রামানুজনকে নিয়ে আলোচনার কালে প্রশ্ন ওঠে তাঁর লস্ট নোট বই নিয়ে—যে বইটি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্ড্রুস

কেম্ব্রিজে খুঁজে পেলেন। এটি সঠিক অর্থে বই নয়, প্রায় 130 পৃষ্টার ফাইল যেখানে ছ'শর বেশি অভিজ্ঞান বা আইডেনটিটি আছে। এই অভিজ্ঞানের সবকটি যে রামানুজনের শেষ জীবনের কাজ—সেখানে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন—এগুলি কবে ইংলণ্ডে এসেছে। লস্ট নোটবুকের ফাইলটি পাওয়া যায় ওয়াটসনের রেখে যাওয়া কাগজ পত্রের সঙ্গে। ওয়াটসন-উইলসন 1929 সাল থেকে রামানুজনের নোটবইয়ের সম্পাদনায় লাগেন। তার আগে 1928 সালে হার্ডি আমেরিকায় চলে যান। এবং ভারতবর্ষ থেকে নোটবইয়ের হাতে লেখা কপি পাঠানো হয় হার্ডি-ওয়াটসনের কাছে। চলে যাবার আগে নোটবইয়ের কপি দুটি ওয়াটসনকে দিয়ে যান হার্ডি। তখন কি রামানুজনের অন্যসব কাগজ পেয়েছিলেন ?—রঙ্গনাথন (S. R. Ranganathan) তাঁর লেখা রামানুজনের জীবনীটিতে একটি গল্প শুনিয়েছিলেন—প্লানচেটে রামানুজনকে এনে তাঁর গণিতের পরিচিতি জানার চেষ্টা।—বলেছেন, দ্বিতীয়বার নির্দিষ্ট দিনে প্লানচেটে তাঁকে ডেকে এনে ভারতীয় গণিতবিদরা জানেন--সেই গণিতটি-অভিজ্ঞানটি একটি মক থিটাফাংশনের উদাহরণ।—অর্থাৎ একসময় ভারতবর্ষে রামানুজনের ফেলে রাখা কাগজপত্র নিয়ে গাণিতিক সমাজে কৌতূহল জেগেছিল। সে সব কাগজগুলি কি লস্ট নোটবুকের অংশ ? অথবা জানকী যে কাগজ-গুলির কথা বলেছিলেন, এগুলি কি সেই কাগজ ? ······1920 সালে জানুয়ারী মাসে দেশে ফিরে হার্ডিকে প্রথম চিঠি লিখলেন রামানুজন—সঙ্গে মকথিটা ফাংশনের কিছু উদাহরণ। ঐ বছরের ছাব্বিশে এপ্রিল মারা যাবার আগে হার্ডিকে আর কোনো চিঠি দিয়েছিলেন কিনা—সঠিক জানা যায় না। অথচ এন্ড্রুজ-আস্কের কাছ থেকে জানা গেছে এই লস্ট নোটবুকে আছে মডুলার ফাংশন, Q সিরিজ, ফলস ও মকথিটা ফাংশন। তুলনামূলক ভাবে ফলস ও মকথিটা ফাংশনের উদাহরণ অনেক। এগুলি যে তাঁর শেষ জীবনের চিন্তার ফসল, সেখানে সন্দেহ নেই। 1919 সালে এপ্রিলে তিনি মাদ্রাজে এলেন। মকথিটা ফাংশনের চিন্তার আরম্ভ হয়তো সমুদ্র যাত্রাপথে ;—তবু লেখালেখির পালা শুরু হয় সম্ভবত 1919 সালের শেষদিকে। 1936 সালের 14ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডন ম্যাথেমেটিকেল সোসাইটিতে বিদায়ী অভিভাষনটি দিলেন অধ্যাপক ওয়াটসন, বিষয় হার্ডিকে লেখা রামানুজনের শেষ চিঠিতে পাঠানো মকথিটা ফাংশনের উদাহরণ মালা। অধ্যাপক ওয়াটসন এই ভাষণে রামানজনের শেষ চিঠিতে পাঠানো উদাহরণের কথাটি সুস্পষ্ট

ভাবে জানালেন। এটি ঐ জানুয়ারি 1920 সালের চিঠি। ওয়াটসনের কথা অনুযায়ী এটিই হার্ডিকে লেখা শেষ চিঠি। অথচ লস্ট নোটবুকে মকথিটা ফাংশনের উদাহরণ ওয়াটসনের জানানো উদাহরণের চেয়ে ঢের বেশি।·······লস্ট নোটবুকের কাগজ কটি হার্ডি ওয়াটসনকে পাঠিয়েছিলেন ? ···এই কাগজকটিই কি রামানুজনের শেষ কাজ ? না বার্নট যেমন ভেবেছিলেন, আরো কাগজ ছিল ? ···

রামানুজনের গণিত নিয়ে গবেষণা করার কালে এজাতীয় প্রশ্ন ওঠে, অথচ এই প্রশ্নমালার জবাব এখনো জানা নেই। নিজের কালের থেকে এগিয়ে থাকা মানুষটি যেন প্রশ্নকে জড়িয়ে নিয়ে বসে আছেন। তাঁর আশ্চর্য গাণিতিক চিন্তার আড়ালে নিজে একটি প্রশ্ন হয়ে আছেন। আর তাঁর কাজ—তা যেন গণিত সমাজের কাছে একটি প্রশ্নপত্র। একজন অনন্য অসাধারণ গণিতজ্ঞ—যার তুলনা গণিতের ইতিহাসে নেই। তবু বর্তমানের গণিত সমাজ ভাবেন, ভবিষ্যতে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মতো অন্য রামানুজনের অবির্ভাব হতে পারে। ফ্রীমান ডাইসন, যিনি কলেজে পুরস্কার হিসাবে রামানুজনের কলেকটেড ওয়ার্কস পেয়ে এবং পড়ে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন, তিনি বলছেন, "দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে পাঠ্য অপাঠ্য হাতের লেখায় যে চিঠিই আসুক, আমি পড়ি। আরেক রামানুজনের চিঠি যদি পাই, সেই আশাতে আছি।" আধুনিক গণিতবিদরা অন্য রামানুজনের আবির্ভাবের স্বপ্ন নিয়ে থাকেন। আর তাঁদের সামনে বিস্ময়ের চিহ্ন হয়ে থাকেন রামানুজন !

গণিত নিয়ে সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন গালিলিও। তিনি বললেন, "মহাবিশ্বের পুঁথিটির ভাষা না জানলে কেউ পড়তে পারবে না—সেই ভাষা হলো গণিত।" চারশ বছর পরে পল ডিরাক একই কথা বললেন, ভাবলেন। তিনি জানেন, গড এক মহাগণিতজ্ঞ। গণিতের ভাষাতে তিনি সৃষ্টির কথা জানিয়ে গেছেন। সুতরাং সেই ভাষার আশ্চর্য অফুরন্ত সুরধ্বণী যার কানে বেজেছে, সে কী করে স্থির থাকে ?······· বিখ্যাত মহিলা গণিতজ্ঞ এমি নোইথারের (Noether) মৃত্যুসংবাদ শুনে আইনস্টাইন বললেন, "শুদ্ধ গণিতকে বলতে পারি যুক্তির কবিতা। নানা সম্বন্ধ সম্পর্কের বিস্তীর্ণ ঘেরে, সরল সহজ যুক্তি গ্রাহ্য চিন্তার সমন্বয়ে, ব্যবহারিক ধ্যানধারণার সাধারণরূপ লোকে খোঁজে। আর সেই খোঁজার প্রয়াসে প্রকৃতির নিয়মের অন্দর মহলের চাবি হিসেবে পাওয়া

যায় যুক্তির সৌন্দর্য মাখানো অনৈসর্গিক ফরর্মুলার মালা।"....শৈশবে ইস্কুলে গণিতের চরম সত্য যে কি—তাই জানতে যে চেয়েছিল, সারাজীবন সেই সত্যের সন্ধানে ফর্মুলার পথ কেটে সে এগিয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত সংবদ্ধ বীজের মতো সেই ফর্মুলা—যেন মহাজন পদাবলীর একেকটি পদ; যে পদ পরে অন্যের হাতে সুরে তালে লয়ে আখরে সমৃদ্ধ হয়ে কালপ্লাবী কীর্তন হয়ে দাঁড়াতে পারে। অথচ সত্যের সন্ধানী মানুষটি গণিতের কীর্তনিয়া হতে চাননি। তিনি শুধু পদ লিখে রেখে মহাজন হয়ে রইলেন। সেই পদে সুর আখর দেবার দায় অন্যের। সেখানে তিনি আগ্রহহীন। শুদ্ধ গণিত নিয়ে কবিতা লেখার মন ছিল তাঁর। সেই কবিতার শব্দ কীভাবে যে ভেসে আসে, তা কি জানা যায়?

আইনস্টাইন বললেন, "গড কী ভাবে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেটি জানতে চাই। এইসব ঘটনা, বর্ণছত্র, মৌলকণা—এদের নিয়ে আমরা কৌতূহল নেই। জানতে চাই গডের চিন্তা; বাকি সব শুধু ডিটেলস।"

আইনস্টাইন গডের চিন্তা জানতে চেয়েও, ডিটেলস নিয়ে বিজ্ঞানে রইলেন, প্রমাণ খুঁজে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন। রামানুজনের খোঁজা আরো বিমূর্ত। ডিটেলসে তাঁর কৌতূহল নেই। কবিতার মতো গণিতেও তিনি পুরনো শব্দ খুঁজে পেলেন, তাঁদেল অর্থ জানলেন। সেই শব্দ বিদীর্ণকরে নতুন অর্থও আনতে পারলেন। তাঁর ফর্মুলা যেন কবিতা, গণিতের কবিতা; পুরনো আর নতুন অর্থ নিয়ে সেখানে শব্দরা সৃষ্টির গন্ধ মেখে থাকে।

তিনি শব্দের বীজ পুঁতে গেলেন। জানেন সেই বীজের গাছ একদিন ফলে ফুলে ভরে উঠবে। তবে সেই ফলেফুলেভরা গাছকটি দেখার আগ্রহ তাঁর ছিল না। সেগুলি ডিটেলস। সত্য শুধু বীজ। তাছাড়া উদ্যান দেখার সময় তাঁর কোথায়?

অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ের অধিকারী স্বল্পায়ু মানুষটি কত সহজে, অনায়াসে মহাকালের রাখালিয়া কাজ করে চলেছেন! কত পরিপূর্ণ সেই ছবি!

Sen of man/you cannot say, or guess, for you know only/a heap of broken images

(মানবসন্তান, সে তোমার বচনচিন্তার বাইরে, কারণ তুমি শুধু দেখেছ বিচূর্ণিত সত্তা!)

টিকা

অধ্যায় এক ঃ

i) হার্ডিকে লেখা প্রথম চিঠির সঙ্গে যে কটি গণিত রামানুজন পাঠিয়েছিলেন, তার 16টি হার্ডি-লিটলউডকে চমৎকৃত বিস্মিত করেছিল। তবে প্রথমদিনে আড়াই ঘণ্টা সময়ে কয়টি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছিলেন, তা জানা যায় না।

ii) বিবিসিতে উর্দু প্রচার সূচী আরম্ভ হলে রামানুজন সম্পর্কে ভাষণটি নেভিল উর্দু ভাষায় প্রচার করেছিলেন। পরে তিনি সেই ভাষণটি ইংরিজতে রূপান্তর করেন।

অধ্যায় দুই ঃ

i) রামানুজনের প্রথম জীবনী লেখেন সেশু আয়ার। কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত কলেকটেড পেপার্সে এই জীবনী আছে ; তাছাড়া রামচন্দ্র রাও এর স্মৃতি কথাটি এই বইটিতে আছে। রামানুজনের দ্বিতীয় জীবনী লেখেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়েন লাইব্রেরিয়ান অধ্যাপক এস আর রঙ্গনাথন। তৃতীয় জীবনী ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত শ্রীসুরেশ রামের লেখা। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যাবতীয় জীবনী যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে আছে সেশু আয়ার। রঙ্গনাথনের বইটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হলেও, তথ্য নিষ্ঠার অভাব আছে। সুরেশ রামের বইটিতেও তথ্য বিচ্যুতি আছে।

ii) রামানুজনের বাবার নাম শ্রীনিবাসন আয়েঙ্গার। দক্ষিণী রীতিতে এই নামটি রামানুজনের নামের আদ্যাক্ষর 'এস' এ নিহিত। শ্রীসুরেশ রাম কিন্তু বাবার নাম কুপ্পুস্বামী বলে জানিয়েছেন।

iii) সেকালীন উনবিংশ শতাব্দীর দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পরিবারে দুটি বিষয়ের চর্চা হতো—সংস্কৃত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। স্বাভাবিকভাবে রামানুজন এ দুটি শিখেছিলেন। তিনি শোনা যায়, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানের সেকালীন রীতি অনুযায়ী সংস্কৃতে কথা বলতে পারতেন। তবে সে যুগে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা হিসেবে প্রধানত সংস্কৃতই ছিল। রামানুজন কলেজে সংস্কৃতকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে নিয়েছিলেন।

অধ্যায় তিন ঃ

i) রামানুজন প্রাইভেট এফ. এ. পরীক্ষা দেন ডিসেম্বরে—যে কথাটি সেশু আয়ার জানিয়েছেন। এই সময়টি বর্তমানের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না।

ii) অধ্যাপক রামস্বামী আয়ার ও ন্যরায়ণ আয়ার—দুজনেই বিদেশে গণিত শিক্ষা করেছিলেন।

iii) জানকীর বিয়ের সময় বয়স ছিল নয়। তবে শ্রীসুরেশ রাম জানিয়েছেন এই বয়স হলো এগারো। এটি ঠিক নয়।

অধ্যায় চার ঃ

i) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রামানুজনের বৃত্তি দেবার প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল জাস্টিস পি. আর. সুন্দরম আয়ারের।

অধ্যায় পাঁচ ঃ

i) রামানুজনের সুবিখ্যাত ফর্মুলা যাকে হার্ডি-লিটলউড বলেছেন 'মাস্টার ফর্মুলা' এবং যার সাহায্যে রামানুজন অনেক সমস্যার প্রায় শুদ্ধ সমাধান টানতে পারতেন। সেটি হলো ঃ—

যদি $F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\phi(k)\,(-x)^k,}{k!}$

তবে

$\int_0^{\infty} x^{n-1} F(x)dx = y(n)\phi(-n)$; এখানে $\Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1}\, dx.$

রামানুজনের এই 'অনমিত' ফর্মুলার কোনো লজিক হার্ডি খুঁজে পান নি। তবু এই ফর্মুলার সাহায্যে সহজেই সমাধান খুঁজে পেতেন রামানুজন !

অধ্যায় ছয় ঃ

i) প্রথম ভারতীয় হিসেবে রামানুজন কেম্ব্রিজের ফেলোশিপ পান। তাছাড়া সম্ভবত কেম্ব্রিজের ফিলোজফিকেল সোসাইটির প্রথম ভারতীয় ফেলো-তিনি।

ii) এল জি রজার্স যে ফর্মুলাটি 1894 সালে আবিষ্কার করেন সেটি হলো ঃ--

$$\frac{q^{1/5}}{1+}\quad\frac{q}{1+}\quad\frac{q^{2}}{1+}\quad\ldots q=e^{-2\pi a}\quad;\quad a>o$$

নোটবুক ওয়ানের 146 ও 160 পৃষ্ঠায় এই ফর্মুলা ও এটি ছাপিয়ে যে ফর্মুলাটি পেলেন যাকে হার্ডি বলেছেন রজার্স-রামানুজন আইডনেটিটি তা আছে।

iii) ওয়াটসনের উদ্ধৃত কবিতাটি সুইন বার্নের লেখা Proserpine কবিতার প্রথম স্তবক।

অধ্যায় সাত ঃ

i) ওয়াটসনের জানানো নোট বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে বর্তমানে প্রকাশিত নোট বইয়ের টি আই এফ আরের সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যার অসঙ্গতি আছে।

ii) রামানুজনের প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা 34টি, যার মধ্যে সাতাশটি বিদেশে, চারটি ভারতীয় গণিত সমাজের জার্নালে ও তিনটি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। প্রকাশিত ভারতীয় জীবনীতে এই সংখ্যা কম জানানো হয়েছে।

iii) রামানুজন তাঁর নোটবই কটিতে নিজস্ব প্রতীক চিহ্নে লিখে গেছেন। ওয়াটসন ও বার্নট তাঁদের সংস্করণে আধুনিক প্রতীকে তার ফর্মুলা-আইডেনটিগুলিকে রূপান্তরিত করেছেন।

iv) নোটবই-টু এর বার্নটকৃত সম্পাদনাটি তিন ভল্যুমে প্রকাশ হবার কথা।

v) হার্ডি ও মেজর মেকমোহন (যিনি রামানুজনের FRS হওয়ার জন্য উদ্যোগী ছিলেন) এঁদের মতে রামানুজনের শ্রেষ্ঠ ফর্মুলাটি হলো ঃ—

$$p(4)+p(9)x+p(14)x^2+\ldots=$$

$$\frac{5\{(1-x^5)(1-x^{10})(1-x^{15})\ldots\}^5}{\{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\ldots\}^6}$$

অধ্যায় আট ঃ

i) 1987 সালে বার্ণ্ট যখন জানকী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন, তখন রামানুজনের শৈশবের এক ঘরের বাড়িতে তাঁকে দেখেন। সেখানে সাতজন নয়—তখন এগারো জন বাস করতেন এবং কলের জলের বন্দোবস্থ ছিল না।

ii) শেষ দুটি কবিতার লাইন টি এস এলিয়টের।

iii) গোসপার যখন রামানুজনকে কম্পুটারের সঙ্গে তুলনা করেন, তখন একটি শব্দের ইঙ্গিত ভেসে আসে। কম্পুটারের সফট ওয়ার-হার্ড ওয়ারের সঙ্গে তুলনা করে মানুষের মাথাকে বলা হয় ওয়েট-ওয়ার। বিজ্ঞানীদের ভাবা ওয়েট ওয়ারের সার্থক উদাহারণ হলেন শ্রীনিবাস রামানুজন!

গ্রন্থপঞ্জী

1. Ramanujan S—Note books Vol I & II (TIFR Bombay)
2. HARDY G. H.—Ramanujan (Chelsea Publishing Co. 1940)
3. Ramanujan S—Unpublished manuscripts (Mathematical Library, Oxford 1980)
4. Ramanujan S—Collected papers (Chelsea Publishing Co. 1985)
5. Suresh Ram—Srinivasa Ramanujan (National Book Trust, India—1979
6. Ranganathan S. R.—Ramanujan (Asia Publishing House)
7. Bell ET—Men of Mathematics (Simon and Schuter 1965)
8. Boyer Carl B—History of Mathematics (Wiley 1968)
9. Littlewod J. E.—A Mathematian's Miscellany. (Methun & Co Ltd, London)
10. Adrews G. E., etall—An introduction to Ramanujan's 'Lost' Note Book (Am. Math. Monthly 1979/86)
11. Berndt C. Bruce—Ramanujan's Note book (Math. Mag 1978/51)
12. Rankin R. A.—Ramanujan's Manuscript & Note Book (Bull. Lond. Math. Soc. 1982/14)
13. Berndt C. Bruce—Ramanujan's Note Book Part I & II (Springer-Verlog)
14. Indian Institute ot Science, Bangalore—Srinivasa Ramanujan Centenary 1987

News Release (USIS) (Oct/1987)
Science Vol 236 (June/1987)
Scientifc American (Feb/1988)
New Scientist (Dec/1987)
Science & Culture (June/1937)